জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

National Institute of Mass Communication Journal

বর্ষ ৩ | সংখ্যা ৩ | ১৪২৬

Year 3 | Volume 3 | 2019

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল
National Institute of Mass Communication Journal

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

National Institute of Mass Communication Journal

বর্ষ ৩ সংখ্যা ৩ ১৪২৬

Year 3 Volume 3 2019

উপদেষ্টা

শাহিন ইসলাম, এনডিসি

সম্পাদক

মো. মাসুদ করিম

নির্বাহী সম্পাদক

আইরিন সুলতানা

সম্পাদনা পরিষদ

মহাপরিচালক

অতিরিক্ত মহাপরিচালক

উপ-সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়

পরিচালক (প্রশি. প্রকৌ.)

পরিচালক (প্রশা. ও উন্ন.)

পরিচালক (প্রশিঃ অনুঃ)

উপ-পরিচালক (দৃশ্যসজ্জা ও রেখাঃ প্রশিঃ)

উপ-পরিচালক (ক্যামেরা ও আলোকসম্পাত প্রশিঃ)

উপ-পরিচালক, (গবেষণা, চঃ দাঃ)

উপ-পরিচালক, (টিভি অনুঃ প্রশিঃ, চঃ দাঃ)

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল
National Institute of Mass Communication Journal
বর্ষ ৩ সংখ্যা ৩ ১৪২৬
Year 3 Volume 3 2019

সম্পাদক	:	মো: মাসুদ করিম
নির্বাহী সম্পাদক	:	আইরিন সুলতানা
প্রকাশক	:	মহাপরিচালক জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা	:	মো: কামরুল ইসলাম
কম্পিউটার কম্পোজ	:	মোছা: সাজেদা খাতুন
পৃষ্ঠাসজ্জা ও মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা	:	সংবেদ ৮৫/১, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
মূল্য	:	১০০.০০ (একশত) টাকা
Price	:	100.00 (One Hundred) Taka
পরিবেশক	:	জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

যোগাযোগ
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
১২৫/এ, দারুস সালাম, এ. ডব্লিউ, চৌধুরী রোড, ঢাকা-১২১৬
ফোন : ৫৫০৭৯৪২৮, ফ্যাক্স : +৮৮০২৫৫০৭৯৪৪৩
e-mail : dg@nimc.gov.bd
Website : www.nimc.gov.bd

Contact
National Institute of Mass Communication
125/A, Darus Salam, A. W. Chowdhury Road, Dhaka-1216
Phone : 55079428, Fax : +88 0255079443
e-mail : dg@nimc.gov.bd
Website : www.nimc.gov.bd

সম্পাদকীয়

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের গবেষণা সাময়িকীর তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশের সূচনালগ্নে সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

গবেষণা সাময়িকীর এ সংখ্যায় মোট ০৯ (নয়) টি লেখা মুদ্রিত হলো। দেশের প্রথিতযশা লেখক, সাংবাদিক ও গবেষকগণ তাঁদের মূল্যবান লেখা দিয়ে অসামান্য অবদান রেখেছেন। জার্নালের প্রথম প্রবন্ধটি গণমাধ্যমকর্মী ও কলামিস্ট কাজী আলিম-উজ জামানের, তিনি সংবাদপত্র শিল্পে প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে একটি পর্যালোচনামূলক লেখা লিখেছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে চলচ্চিত্রের কারিগর আলমগীর কবির ও তাঁর চলচ্চিত্রের নিয়ে আলোকপাত করেছেন চলচ্চিত্র সাংবাদিক ও চিত্রনাট্যকার শ্যামল দত্ত। আবুল মনসুর আহমদের সাহিত্য প্রসঙ্গের বিভিন্ন বৈচিত্র্য তুলে ধরেছেন বিনয় দত্ত। স্থানীয় সংবাদপত্রের বিকাশ ও বিকাশের অন্তরায়, চ্যালেঞ্জ, মূলধারার গণমাধ্যমের সাথে এর পার্থক্য এবং ইন্টারনেটের অভাবনীয় বিকাশের প্রেক্ষিত এর চাহিদার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন সাংবাদিক আমীন আল রশীদ। ড. মাহবুবা হাসনাত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে যেই বিষয়গুলো বাদ পড়েছে সেইসব বিষয় ইতিহাসে আরো তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে বলে আলোচনা করেছেন তাঁর লেখনীতে। গণমাধ্যমে জনমত বিনির্মাণ বিষয়ের লেখাটি লিখেছেন বাংলাদেশ বেতারের কর্মকর্তা দেওয়ান মোহাম্মদ আহসান হাবীব। Response of receivers to tropical cyclone messages broadcast in Bangladesh: A lesson from Amtoli upazila of coastal Bargura district নিয়ে গবেষণামূলক লেখাটি লিখেছেন শেখ মুহম্মদ রেফাত আলী। Utilization of Community Radio to Ensure Women Empowerment in Bangladesh নিয়ে লিখেছেন ড. এ কে এম আনিসুর রহমান এবং সর্বশেষ লেখাটি শামরিন জাহান ঝুনুর Evaluating Gender Sensitivity in Three Mainstream Bangladeshi Cinema: A Critical Analysis.

সাময়িকীর তৃতীয় সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা জানাই প্রাক্তন মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব মোহাম্মদ আজহারুল হক (অতিরিক্ত সচিব) তথ্য মন্ত্রণালয় ও বর্তমান মহাপরিচালক বেগম শাহিন ইসলাম, এনডিসি মহোদয়কে এবং সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দকে। মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনা এবং সম্পাদনা পরিষদের প্রত্যক্ষ উদ্যেগ ও পরিচর্যার ফলে সাময়িকীটি সুন্দরভাবে মুদ্রণ করা সম্ভব হয়েছে। জার্নালের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাছি তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে।

সাময়িকীর তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মো: মাসুদ করিম
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

সূচি

ঢাকাকেন্দ্রিক সংবাদপত্র শিল্পে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার : একটি পর্যালোচনা ৯
কাজী আলিম-উজ-জামান

আধুনিক চলচ্চিত্রের কারিগর আলমগীর কবির ২১
শ্যামল দত্ত

প্রাসঙ্গিক সাহিত্য ভাষায় আবুল মনসুর আহমদ ৪১
বিনয় দত্ত

স্থানীয় সংবাদপত্র : সংকটের দোলাচল ৫১
আমীন আল রশীদ

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা জরুরি ৬৭
ড. মাহবুবা হাসনাত

জনমত বিনির্মাণ : গণমাধ্যম পরিপ্রেক্ষিত ৮৯
দেওয়ান মোহাম্মদ আহসান হাবীব

Response of receivers to tropical cyclone message broadcast in Bangladesh: A leson from Amtoli upazilla of costal Barguna district. ১০৭
Shaikh Muhammad Refat Ali

Utilization of community Radio to Ensure women Empowerment in Bangladesh ১২৫
Dr. A. k. M. Anisur Rahman

Evaluating Gender sensitivity in three Mainstream Bangladeshi cinema: A critical Analysis ১৪১
Sharmin Jahan Juau

ঢাকাকেন্দ্রিক সংবাদপত্র শিল্পে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার একটি পর্যালোচনা

কাজী আলিম-উজ-জামান

কুষ্টিয়ার তরুণ রিপোর্টার তৌহিদী হাসান। ঢাকার রিয়াদুল করিম। দুজনেই মুঠোফোনে লিখে ফেলতে পারেন হাজার শব্দের রিপোর্ট। টাইপিং স্পিডও যথেষ্ট ভালো। মুঠোফোনে দারুণ দারুণ ছবি তোলেন, ছবি সম্পাদনা করেন। ভিডিও করেন, ভিডিও সম্পাদনাও করতে জানেন।

মুঠোফোনে ছবি ধারণ

লক্ষ্য করুন, তৌহিদী হাসান বসবাস করেন একটি 'মফস্বল' শহরে। আর রিয়াদুল করিম রাজধানী শহরে। আমাদের চিন্তায় সাধারণত রাজধানী এগিয়ে থাকে, মফস্বল পিছিয়ে থাকে। রাজধানী 'ফাস্ট, মফস্বল 'স্লো'। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দুজনই সমানে সমান। কেউ কারো চেয়ে পিছিয়ে নেই। এই ভারসাম্য কে তৈরি করেছে? নিজেরাই তৈরি করেছেন আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে।

শুধু কি তরুণ সাংবাদিক? মাঝবয়সী কিংবা প্রবীণ সাংবাদিক, সবাই এখন ব্যবহার করছেন আধুনিক প্রযুক্তি। করতে হচ্ছে।

গত কয়েক বছরে সংবাদপত্র শিল্পে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে, কথাটি বললে কেউ কেউ মনে করতে পারেন অতিসরলীকরণ করা হচ্ছে। কিন্তু গত দুই দশক যাবৎ সংবাদপত্রের একজন ক্ষুদ্র কর্মী হিসেবে জানি ও বিশ্বাস করি, কথাটা কতটা সত্য। অনেকে হয়তো বলবেন, এটা যুগের দাবি। তা অস্বীকার করা যাবে না। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ এবং সমাজে তা গ্রহণ, এটা একটা দিক। কিন্তু সব ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কি পরিবর্তনকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে? নিশ্চয়ই না। সব গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান যে গ্রহণ করতে পেরেছে, তা-ও নয়। তবে ঘোষণা দিয়ে বলা যায়, যারা গ্রহণ করবে, তারাই টিকে থাকবে। যারা করবে না, তারা হারিয়ে যাবে। এটাই বাস্তবতা, এটাই স্বাভাবিক।

গত কয়েক বছর যাবৎ সরকারের তরফ থেকে তথ্যপ্রযুক্তিকেন্দ্রিক সেবায় নানা ধরনের ছাড় দেওয়া হচ্ছে। কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মুঠোফোনের আমদানি শুল্ক কমিয়ে দাম সাশ্রয়ী রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তারপরও নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের চ্যালেঞ্জ হলো, হঠাৎ করে বড়সড় বিনিয়োগ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান সেই ঝুঁকি নিতে চায় না বা নেয় না। কিন্তু এটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভুল বলে প্রমাণিত হয় পরবর্তী সময়ে। কারণ, এতে ওই সব প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের দক্ষতার উন্নতি ঘটে না। দিনে দিনে তারা 'ব্যাকডেটেড' হয়ে পড়ে। কর্মীরা পিছিয়ে পড়লে প্রতিষ্ঠানও এগোতে পারে না।

এটা খুবই আনন্দের যে ঢাকাকেন্দ্রিক বেশির ভাগ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান নতুন প্রযুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে। এ লেখায় আমি কেবল সংবাদপত্র বা খবরের কাগজ কীভাবে, কতটা নতুন প্রযুক্তিকে গ্রহণ করেছে এবং এর সুবিধা কাজে লাগাচ্ছে, সে প্রসঙ্গে আলোচনা করব। টেলিভিশন বা অনলাইনের ব্যাপার-স্যাপার এ লেখায় আসবে না। আর নতুন প্রযুক্তি সংবাদপত্রের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলেছে বলে যে আশঙ্কার কথা আমরা গত দুই দশক ধরে শুনছি, তা-ও এ লেখায় আসবে না। বরং নতুন প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে কীভাবে সংবাদপত্রশিল্প এগিয়ে যাচ্ছে, এ লেখার উদ্দেশ্য কেবল তা-ই।

টেলিপ্রিন্টার

১.

যারা সাংবাদিকতায় পুরোনো, তারা হয়তো টেলিপ্রিন্টারের কড়কড়, ঘড়ঘড় আওয়াজের কথা ভুলতে পারেন না কিংবা টেলিপ্রিন্টারে খবর প্রিন্ট হয়ে মেঝেতে সাপের মতো গড়াগড়ি খাওয়ার দৃশ্য। অথবা ফ্যাক্সের কড়কড়কড় আওয়াজ। হয়তো কিছু সময়ের জন্য পিয়ন নেই। এর মধ্যে প্রচুর খবর টেলিপ্রিন্টারে চলে এসেছে। খবরের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে নিউজরুম। বার্তা ব্যবস্থাপকদের হাঁকডাক, তোড়জোড়।

সেই দিন আর নেই। এখন বার্তাকক্ষে এসেছে আধুনিকতা। পাঠকপ্রিয় বেশির ভাগ পত্রিকার বার্তাকক্ষে এখন আর টেলিপ্রিন্টারে খবর আসে না। সব খবর এখন মেইলে চলে আসে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাউনলোড হয়ে যায় সফটওয়্যারের সহায়তায়। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় খবর বণ্টন হয়ে যায় সহসম্পাদকদের মাঝে। সহসম্পাদক সম্পাদনা শেষ করার পর আবার সেটা কম্পিউটারেই প্রয়োজনীয় সংশোধন করেন শিফট ইন চার্জ বা জ্যেষ্ঠদের কেউ। খুব বেশি প্রয়োজন না হলে প্রিন্ট দেওয়ারও দরকার পড়ে না। আমার কাছে কোনো পরিসংখ্যান নেই, তবে এটুকু বলতে পারি, বার্তাকক্ষে এখন যত কাগজ খরচ হয়, তা এক দশক আগে হওয়া খরচের অর্ধেকের কম হবে। তবে ফ্যাক্স মেশিনটা এখনো রয়ে গেছে। আগে

হয়তো দুটো ছিল। এখন একটাতেই চলে। বিভিন্ন সংগঠনের আমন্ত্রণপত্র, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, বিবৃতির কিছু কিছু ফ্যাক্সে আসে এখনো। তবে বিদেশি এনজিও, দাতা সংস্থা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি সাধারণত মেইলে আসে।

সরকারের তথ্য বিবরণী কয়েক বছর আগেও খামে পাঠানো হতো। এখন সেখানেও লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। সব তথ্য বিবরণী এখন প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট বা পিআইডির ই-মেইলে থাকে।

তবে সবাই কম্পিউটারে কাজ করলেও এখনো কম্পোজ বিভাগ পুরোপুরি উঠে যায়নি। স্বল্প কলেবরে টিকিয়ে রাখা হয়েছে বা টিকে আছে। কারণ, বাইরে থেকে যে লেখা পত্রিকা অফিসে আসে, তার একটি অংশ এখনো হাতে লেখা কপি। বিশেষ করে সম্পাদকীয় বিভাগে, সাহিত্য বিভাগে যে লেখা আসে, তার একটি বড় অংশ এখনো হাতে লেখা কপি। সামনে এ অবস্থার আরও পরিবর্তন হবে ধরে নেওয়া যায়।

২.

ঢাকার কোনো কোনো খবরের কাগজ এখন উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে। সে বিষয়ে কিছুটা ধারণা দিতে চাই। এমন কিছু সফটওয়্যার এখন কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান চালু করেছে যে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা যেকোনো স্থান থেকে এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে লেখা, ছবি, ভিডিও পাঠাতে পারেন। প্রত্যেকের নিজস্ব আইডি ও পাসওয়ার্ড রয়েছে। সেটা দিয়ে ঢুকে তাঁরা কাজ করতে পারেন। ধরা যাক, দুজন রিপোর্টারের একজন ঢাকা, আরেকজন চট্টগ্রাম থেকে লিখছেন। দুজনই লেখা শেষ করে একই সময়ে পাঠালে সেকেন্ডের কোনো ব্যবধান না ঘটিয়ে একই সময়ে তা নির্ধারিত বাস্কেটে জমা হবে। অর্থাৎ দূরত্ব এখানে কোনো সমস্যা নয়। ই-মেইলের সঙ্গে এই ব্যবস্থার পার্থক্য হলো, ই-মেইলে লেখা ডাউনলোড করা লাগে। তাতে ব্যয় হয় গুরুত্বপূর্ণ সময়। কিন্তু এখানে তার প্রয়োজন হয় না।

আবার শাখা অফিসে কী কাজ হচ্ছে, সেখানকার রিপোর্টাররা কী রিপোর্ট লিখছেন, ফটোগ্রাফাররা কী ছবি তুলছেন, সব ঢাকায় বসেই দেখা যাচ্ছে। গ্রাফিকস বিভাগে পাতার মেকআপ কীভাবে কতটা হচ্ছে, কতটা এগোচ্ছে, নিজের চেয়ারে বসেই আপনি তা দেখতে পারছেন। এখানে রিপোর্টার, সাব-এডিটর, ফটোগ্রাফার, গ্রাফিক ডিজাইনার সবাই একই সফটওয়্যারের ভেতরেই দিনের কাজ করেন।

সম্পাদক বা ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসেবে আপনি যদি হিসাব চান বা আপনি আপনার কর্মীদের আরও জবাবদিহির মধ্যে আনতে চান, তাহলেও এখানে ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ একজন রিপোর্টার সপ্তাহে মোট কতটি রিপোর্ট লিখলেন বা মোট কত শব্দ লিখলেন, একজন সাব-এডিটর মোট কত শব্দ সম্পাদনা করলেন, একজন আলোকচিত্রী মোট কতটি ছবি তুললেন, এর মধ্যে কতটি প্রকাশিত হলো, একজন গ্রাফিক ডিজাইনার সপ্তাহে কতটি পাতা মেকআপ করলেন, সব তথ্য প্রায় নির্ভুলভাবে এই সফটওয়্যার থেকে পাওয়া সম্ভব। শুধু তা-ই নয়, একটা রিপোর্ট মোট কতবার সম্পাদিত হয়েছে এবং প্রতিবার কী কী পরিবর্তন করা হয়েছে, তা-ও জানা সম্ভব। জানামতে, ঢাকার বেশ কয়েকটি পত্রিকা এখন এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করছে।

খবরের কাগজ অফিসে যাঁরা বানান সংশোধন করেন, তাঁদের পদের নাম সম্পাদনা সহকারী। আগে যা ছিল প্রুফরিডার। এখন ইংরেজি কাগজগুলোতে এই পদটি উঠে গেছে। কারণ, ইংরেজি বানান এখন আর ভুল হয় না! লেখার সময়ই 'অটো কারেকশন' ব্যবহার করে ঠিক করে নেওয়া হয়। বাংলা কাগজগুলোতে এখনো সম্পাদনা সহকারী পদটি টিকে আছে। তবে সংকুচিত হয়ে গেছে। আমাদের অনেকের ধারণা, এই পদ ও বিভাগটি নিকট ভবিষ্যতে আরো সংকুচিত হয়ে পড়বে। কারণ, এখন বাংলা বানান সংশোধনেরও সফটওয়্যার বেরিয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি তো বেশ কার্যকর। কিছু কিছু গণমাধ্যম তা ব্যবহারও করছে। আপনি কোনো একটা বানান ভুল লিখলে সঠিক বানানটি আপনার সামনে হাজির হবে। আপনি যদি নিশ্চিত হন যে সেটি সঠিক, তবে তাৎক্ষণিকভাবে শুধরে নিতে পারবেন। (আমি নিজেও একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করে এই লেখাটির বানান সংশোধন করে নিয়েছি।) যদিও এসব সফটওয়্যারের কিছুটা সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে।

এ তো গেল বানান সংশোধনের সফটওয়্যারের কথা। কিছুদিন আগে একটি কর্মশালায় আমাদের দেখানো হলো একটি সফটওয়্যারের বিশেষত্ব। মুঠোফোনে ওই অ্যাপটি চালুর পর আপনি মুখে যা-ই বলবেন, লেখা হয়ে যাবে। আপনাকে কিছু লিখতে হবে না। আপনি শুধু বলবেন। তবে অবশ্যই চলিত বাংলায় বলতে হবে। কোনো আঞ্চলিক ভাষা গ্রহণযোগ্য নয়! এই অ্যাপটি এখনো চালু হয়নি বটে, তবে কড়া নাড়ছে। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে কেউ কেউ এ রকম একটি অ্যাপ ব্যবহার করেন।

ঢাকার কোনো কোনো সংবাদপত্র এখন অগ্রসর পাঠকদের জন্য কিউআর কোড বা বারকোড দিচ্ছে। ধরা যাক কোনো একটি খবরের সঙ্গে ভিডিও আছে। ভিডিওটি কেবল অনলাইন নয়, পত্রিকার পাঠকদেরও এই ভিডিও দেখাতে চায় কর্তৃপক্ষ। তখন এই ভিডিওর কিউআর কোডটি বসানো হয়। যেকোনো স্মার্টফোন দিয়েই এই কিউআর কোড স্ক্যান করা যায়। এর জন্য অবশ্য কিউআর অ্যান্ড বারকোড স্ক্যানার অ্যাপ ইনস্টল করে নিতে হবে। যেকোনো অ্যাপ স্টোরে এই অ্যাপ রয়েছে। অ্যাপটি চালু করলে অনেকটা ক্যামেরার মতোই দেখায়। কিউআর কোডের সামনে ফোন ধরলেই এর ভেতর কী কী তথ্য আছে, সব দেখা যাবে। খবরের কাগজে কিউআর কোডের ব্যবহার ইদানীং বেশ জনপ্রিয় হয়েছে।

৩.

ঢাকায় রিপোর্টারদের একটা বড় অংশই এখন মুঠোফোনে রিপোর্ট লিখছেন। সারা বিশ্বেই এখন স্মার্টফোন সাংবাদিকতার কাজের ধরন বদলে দিচ্ছে। এখন সেমিনার, গোলটেবিল-বিষয়ক ছবি তোলার জন্য আলাদা করে ফটোগ্রাফার পাঠানোর প্রয়োজন হচ্ছে না। রিপোর্টারই তাঁর আইপ্যাড বা মুঠোফোনে ছবিটা তুলে নিচ্ছেন। এতে সময় বাঁচছে এবং ফটোগ্রাফারের ওপর চাপ কমছে। ছবি ও খবর দ্রুততম সময়ের মধ্যে অনলাইনে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। পরে অফিসে এসে রিপোর্টার অনলাইন থেকে ওই অংশটুকু নিয়ে পত্রিকার জন্য নতুন করে লিখছেন। অনলাইনের পাঠকের চেয়ে পত্রিকার পাঠকেরা ভিন্ন ও নতুন কিছু পাচ্ছেন। এতে চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হচ্ছে সাংবাদিকতা।

কেবল রিপোর্টাররাই নন, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজেকে বিকশিত করছেন সাব-এডিটর বা কপি এডিটরও। আগে তাঁরা বিদেশি বার্তা সংস্থা পরিবেশিত খবর হাতে অনুবাদ করতেন। তারপর সেগুলো কম্পোজ হতো। এতে সময় লাগত প্রচুর। এখন কপি সম্পাদকেরা সবাই কম্পিউটারেই কাজ করেন। একবারেই কাজটা হয়ে যায়। একই কথা প্রযোজ্য মফস্বল থেকে আসা কপির বেলায়ও। ফ্যাক্সের ওপর কাটাকুটির দিন শেষ। এখন সম্পাদনা কম্পিউটারে। শুধু কি তাই? এখন কপি এডিটর বা পেজ এডিটররাই পাতার প্রাথমিক মেকআপ-ডিজাইনের ৮০ থেকে ৯০ ভাগ কাজ শেষ করে দেন। অর্থাৎ সহসম্পাদকেরাই কোয়ার্ক এক্সপ্রেসের কাজ শিখে নিয়েছেন। তাঁরাই পাতার

মেকআপ তৈরি করে রিপোর্ট, ছবি বসিয়ে দেন। এরপর যায় গ্রাফিক ডিজাইনারের কাছে। ডিজাইনার তাঁর পেশাদারি হাতে সৌন্দর্য বর্ধনের বাকি কাজ করে পাতাটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন।

৪.

এবার দেখে আসি ঢাকার বাইরের রিপোর্টারদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের হালহকিকত।

বুদ্ধজ্যোতি চাকমা। পার্বত্য জেলা বান্দরবানের একজন সাংবাদিক। প্রায় আড়াই দশক ধরে সাংবাদিকতার মধ্যে আছেন। এখন একটি জাতীয় দৈনিকের জেলা প্রতিনিধি। এর আগেও বিভিন্ন গণমাধ্যমে কাজ করেছেন। একসময় তিনি এবং এই জেলার অন্য সাংবাদিকেরা ঢাকায় মূল অফিসে খবর পাঠাতেন ডাকযোগে। খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হলে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। ধরা যাক, একটি ঘটনা কোনো এক শনিবার ঘটেছে। ঢাকায় গিয়ে খবরটি পৌঁছাতে পৌঁছাতে এবং ছাপা হতে হতে মঙ্গল বা বুধবার।

এরপর জেলা শহরে এল ফ্যাক্স মেশিন। বুদ্ধজ্যোতি চাকমা স্মৃতি হাতড়ে এই লেখককে জানালেন, ১৯৯৬ সালে তাঁর জেলায় ফ্যাক্স আসে। ফ্যাক্সের মাধ্যমে খবর পাঠিয়ে বেজায় খুশি হন রিপোর্টাররা। কিন্তু একটা সময় ফ্যাক্সও কিছুটা অচল হতে থাকে। সবচেয়ে সমস্যা হলো, রিপোর্ট লিখে ফ্যাক্স করার জন্য অপেক্ষায় থাকতে হয়। কারণ, জেলা শহরে ফ্যাক্সের সংখ্যা কম। আবার কখনো কখনো ফ্যাক্স মেশিন অচল হয়ে পড়ে। ফ্যাক্স যায় ঠিকই, কিন্তু কালি কম-বেশি হয়। ঢাকা থেকে বারবার ফোন, এই লাইন ঠিক নেই, ওই লাইন ঠিক নেই। দুই পক্ষেরই বিড়ম্বনা। তবে হাতে লেখা কপি ফ্যাক্স করলে ঝামেলা বেশি। কম্পিউটার কম্পোজ কপি ফ্যাক্স করলে ঝামেলা কিছুটা কম। কিন্তু ফ্যাক্সে লেখা পাঠানোর সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, একজনের কপি আরেকজন পাঠিয়ে দিচ্ছেন নির্দ্বিধায়। রিপোর্টিংয়ের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হচ্ছে, যার ভেতর দিয়ে খবরটি প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র এবং রিপোর্টার বিশ্বাসযোগ্যতার সংকটে পড়ছেন। অবশ্য হরেদরে সবাই না।

অবশেষে আসে ইন্টারনেট। রিপোর্ট লিখে দ্রুত ই-মেইল করে দিলে কেল্লাফতে। লেখা নামিয়ে সম্পাদনা করে ছাপার জন্য দিয়ে দিলেই হলো।

এরপর ২০০৮ সালে পাহাড়ে পৌঁছায় মুঠোফোন নেটওয়ার্ক, সমতল ভূমিতে নেটওয়ার্ক পৌঁছানোর বেশ কয়েক বছর পর।

বান্দরবান জেলা শহরে সাংবাদিক আছেন একশজনের মতো। এখন কেউ আর ফ্যাক্স ব্যবহার করেন না। সবাই এখন কম্পিউটার, ল্যাপটপে লিখছেন। রিপোর্টারদের প্রায় সবারই আছে ল্যাপটপ বা কম্পিউটার। তথ্য সংগ্রহের পর যাঁর যাঁর রিপোর্ট পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

দেখা যাচ্ছে, প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও এখন রিপোর্টাররা মুঠোফোনেই সব কাজ সারছেন। মুঠোফোনে রিপোর্ট লিখছেন, ছবি তুলছেন, ভিডিও করছেন। তারপর চটজলদি পাঠিয়ে দিচ্ছেন ঢাকায়। কেউ কেউ মুঠোফানে ছবি ও ভিডিও সম্পাদনাও করছেন। অনেকেই লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছেন ঘটনাস্থল থেকে। ঢাকায় ওই রিপোর্ট আসার পর কপি এডিটরদের কম বেগ পেতে হচ্ছে। রিপোর্টও হচ্ছে তরতাজা, টাটকা।

৫৫ বছর বয়সী বুদ্ধজ্যোতি চাকমা জানালেন, তিনি সাধারণত ল্যাপটপেই লিখেন। আবার মুঠোফোনেও লিখতে পারেন। ছবিও তোলেন মুঠোফোনে। তিনি না করলেও তাঁর জেলায় অনেক রিপোর্টারই মুঠোফোনে ছবি সম্পাদনা করতে পারেন।

এবার চোখ রাখতে চাই সমতল ভূমির দিকে। দেবাশীষ সাহা রায়। বয়স ৫৬ বছর। ঠিক ৩০ বছর ধরে সাংবাদিকতা করছেন। তিনি প্রথমসারির একটি জাতীয় দৈনিকের শেরপুর জেলা প্রতিনিধি। তাঁর শুরুটা হয়েছিল দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকা দিয়ে। তাঁর বাবা ছিলেন সংবাদপত্রের এজেন্ট। ছোটবেলা থেকেই খবরের কাগজের গন্ধ মেখে বড় হয়েছেন।

দেবাশীষের কাছে জানতে পারি, প্রযুক্তির কল্যাণে বদলে গেছে তাঁর সংবাদ পরিবেশনের ধরনধারণ। ১৯৮৯ সালের কথা। যে খবরটি দিনের ঘটনাকেন্দ্রিক নয়, যাকে বলে বিশেষ খবর, সেটি পাঠাতেন ডাক বিভাগে। আর যে খবরটি দিনের (ডে ইভেন্ট) ঘটনাকেন্দ্রিক এবং গুরুত্বপূর্ণ, সেটি পাঠাতেন টেলিফোন করে। এরপর ১৯৯৬ সালে শেরপুর জেলা শহরে এল ফ্যাক্স মেশিন। নিউজপ্রিন্টের ছোট ছোট কাগজে (স্লিপ) হাতে লিখে এরপর তা ফ্যাক্স করতেন জেলার সাংবাদিকেরা। এই জেলায় ই-মেইল জনপ্রিয় হয় ২০০৯ সালে। তখন হাতে লেখার কারবার শেষ হয়। সবাইকে শিখতে হয় কম্পিউটার। দেবাশীষও

শিখে নেন। রিপোর্ট লেখা শেষ করে কেবল 'সেন্ড' বাটনে টিপ দিলেই কেল্লাফতে। তেমনি ছবি অ্যাটাচমেন্ট দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই হলো। গত দুই বছর ধরে মুঠোফোনে লিখছেন দেবাশীষ। আলাপকালে তিনি বললেন, প্রযুক্তির ব্যবহারের কল্যাণে দ্রুততম সময়ে পাঠককে সংবাদ পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে। রিপোর্ট পাঠানোর পর সর্বোচ্চ ১৫ মিনিটের মধ্যেই সেটি অনলাইনে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে।

৫.

সংবাদপত্রশিল্পে আধুনিকতার ছোঁয়া কেবল সংবাদ ব্যবস্থাপনায় নয়, এসেছে প্রশাসন-সংশ্লিষ্ট কাজকর্মেও। একটা সময় ছিল, কর্মীরা অফিসে ঢুকে খাতায় সই করে উপস্থিতির জানান দিতেন। মনে আছে, আমি যখন দৈনিক 'আজকের কাগজ'-এর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, ১৯৯৮ সালে, অফিসে যাওয়ার পর খাতায় স্বাক্ষর দিতে হতো। এক ভদ্রলোকের দায়িত্ব ছিল এই খাতা তদারক করা। কেউ দেরি করে এলে তিনি লাল কালির আঁচড় কেটে দিতেন। এই লাল কালির দাগ অতিরিক্ত হয়ে গেলে মাস শেষে নোটিশ এবং বেতন কর্তন। যাক সে প্রসঙ্গ। এরপর এল আইডি কার্ড পাঞ্চের ব্যবস্থা। কার্ড পাঞ্চ করলেই উপস্থিতির দিন-তারিখ রেকর্ড হয়ে যেত। কিন্তু এতে দেখা গেল আরেক বিপত্তি। কোনো কোনো কর্মী দ্বিতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে কার্ড পাঞ্চ করানোর মতো অসাধুতার আশ্রয় নিলেন। এখন সেটাও বাতিল হয়েছে। এখন এসেছে আঙুলের ছাপ ও চেহারা স্ক্যান পদ্ধতি। যন্ত্রের সামনে আপনি দাঁড়াবেন আর রেকর্ড হয়ে যাবে আপনার উপস্থিতির সময়। বিনিময়ে যন্ত্রের কাছ থেকে পাবেন 'থ্যাংক ইউ'।

এর বাইরে কোনো কোনো সংবাদপত্র অফিসে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কথা বলার ব্যবস্থা আছে। ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকেরা মূল অফিস থেকে শাখা অফিসে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মিটিং সেরে নিচ্ছেন। এতে সময় ও অর্থের বিপুল সাশ্রয় হচ্ছে। আর ভিডিও কনফারেন্সের প্রযুক্তি একবার সেট করে নিলেই হলো। ইন্টারনেট চার্জ ছাড়া বাড়তি আর কোনো খরচ নেই।

কেবল তা-ই নয়, একজন রিপোর্টার ঠিকমতো অ্যাসাইনমেন্টে যাচ্ছেন কি না বা তিনি কোথায় আছেন, তিনি সঠিক কথা বলছেন কি না, সেটাও যাচাই করার ব্যবস্থা আছে। ঢাকার একাধিক সংবাদপত্র অফিস এটা চালু করেছিল। এখনো কয়েকটাতে চালু আছে।

এবার ফটোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের দিকে চোখ রাখতে চাই। ফটোগ্রাফির এই পরিবর্তন যদিও অনেকটা সময়ের দাবি। তারপরও প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করা যেতে পারে। ১৮-২০ বছর আগের কথা। তখন এত ক্লিক করার সুযোগও ছিল না। কারণ, যত বেশি ক্লিক, তত বেশি ফিল্ম খরচ। তাই ক্লিক করতে হতো হিসাব করে। তারপর সেই ছবি অফিসে আনার পর প্রায় অন্ধকার একটি ঘরে 'পজিটিভ' বের করার কাজ হতো। এরপর সেই পজিটিভ পেস্টিং করা হতো। এখনকার মতো তখন ছবি তেমনভাবে বাছাই করার সুযোগ কম ছিল। আর ঢাকার বাইরে থেকে আলোকচিত্রীরা ছবি পাঠাতেন প্রিন্ট করে। সেই ছবি থেকে বের করা হতো পজিটিভ। এখন ডিজিটাল ক্যামেরা, স্মার্টফোনে 'ক্লিক' করতে কোনো বাধা নেই। ছবি তোলা এবং বাছাইয়ের পর সম্পাদনা হচ্ছে। এরপর সরাসরি ছবি বসে যাচ্ছে পাতায়।

আরেকটি কথা না বললেই নয়। আলোকচিত্রীরা এখন নিয়মিত প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন অথবা নিচ্ছেন। খবরের কাগজ অফিসের ধারণাও পরিবর্তন হয়েছে। 'ক্যামেরাম্যান' ও 'ফটোগ্রাফারের' পার্থক্য বুঝতে পেরেছেন বেশির ভাগ বার্তা ব্যবস্থাপক। দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্য ফটোগ্রাফারদের পেশাদারিকে উসকে দিচ্ছে। যিনি ভালো ছবি বোঝেন, কিন্তু কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ নেই, তিনিও এক ফাঁকে একটি কোর্স করে নেওয়ার তাগিদ পাচ্ছেন। পরিবর্তনটা এখানে। মানসিকতায়।

এবার বলতে হয় পেস্টিং ও পৃষ্ঠাসজ্জা প্রসঙ্গে। ঢাকার কোনো জাতীয় দৈনিকে এখন হাতে পেস্টিং আছে কি না, জানা নেই। থাকলেও থাকতে পারে। তবে মূলধারার সব দৈনিকই হাতে পেস্টিং বাদ দিয়েছে। এখন কম্পিউটারে পৃষ্ঠাসজ্জা হচ্ছে। পাতা চূড়ান্ত হওয়ার পর পিডিএফ ফাইল সিটিপি (কম্পিউটার টু প্লেট) প্রযুক্তির মাধ্যমে চলে যাচ্ছে প্রেসে। প্লেট বানিয়ে মেশিনের ওপর বসালেই কড়কড় করে বেরিয়ে আসছে টাটকা পত্রিকা।

৬.

সংবাদপত্রশিল্পে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে এখানে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হলো। যদিও বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনার দাবি রাখে। তারপরও এর বিভিন্ন দিক ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে। সমাপ্তিতে এসে এ ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের

বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাই। সাংবাদিকদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিতে পারে এসব সংগঠন। তবেই গণমাধ্যমকে প্রকৃত পক্ষে সহায়তা করা হয়। কেবল পিকনিক বা বার্ষিক ভোজ নয়, সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার মধ্যেই এসব সংগঠনের মাহাত্ম্য নিহিত বলে মনে করি।

লেখক পরিচিতি : কাজী আলিম-উজ-জামান, সহকারি বার্তা সম্পাদক, *প্রথম আলো*

তথ্যসূত্র

লেখকের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে নিবন্ধটি রচিত

আধুনিক চলচ্চিত্রের কারিগর : আলমগীর কবির

শ্যামল দত্ত

১. শুরুর কথা

অনন্য চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবির সম্পর্কে অনেক কথাই বলা যায়। তিনি নিঃসন্দেহে এ দেশের একজন বরেণ্য চলচ্চিত্র স্রষ্টা। বিশেষ করে আমাদের দেশে প্রচলিত চলচ্চিত্রের পাশাপাশি একটি বিকল্প ধারা বা 'প্যারালাল ফিল্ম' নির্মাণের তিনিই সার্থক পথিকৃৎ। এ জন্য এ দেশের আধুনিক চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রেক্ষাপটে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। এ দেশের তথাকথিত বাণিজ্যিক বা সনাতন পদ্ধতির চলচ্চিত্রের বাইরে একটি মুক্তচিন্তার চলচ্চিত্র নির্মাণের ধারণা প্রথম তিনিই দিয়েছিলেন। চলচ্চিত্রের আধুনিক ভাষাও নির্মাণ করেছেন তিনি। চলচ্চিত্রকে আলমগীর কবির প্রথাগত স্বল্প ও পূর্ণ কোনো দৈর্ঘ্যের সীমাতেই আবদ্ধ করতে চাননি। তিনি বলতেন,

আলমগীর কবির (১৯৩৮-১৯৮৯)

চলচ্চিত্র হবে মুক্ত দৈর্ঘ্যের। অর্থাৎ নির্মাতা যেখানে গিয়ে শেষ করতে বা থামতে চাইবেন, সেখানেই থামবেন। এ জন্য তাঁকে দৈর্ঘ্যের বাছবিচার করতে হবে না।

চলচ্চিত্রের অঙ্গনে আলমগীর কবিরকে বিভিন্ন অভিধায় অভিহিত করা যেতেই পারে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, তিনি আধুনিক চলচ্চিত্রের নির্মাতার চেয়েও চলচ্চিত্র নির্মাণের একজন সার্থক কারিগর। তাঁর জন্য বোধ হয় নির্মাতার চেয়ে 'কারিগর' শব্দটিই বেশি মানানসই। 'নির্মাতা' ও 'কারিগর' এ দুটি শব্দ সমার্থক মনে হলেও কারিগর শব্দটির মধ্যে নিজের হাতে গড়ে তোলার বিষয়টা খুব স্পষ্ট হয়। এখানে কারিগর শিল্পী হয়ে ওঠেন। আর সেই শিল্পভাবনা তিনি ছড়িয়ে দেন তাঁর চারপাশের মানুষদের মধ্যে। আলমগীর কবির ঠিক তেমনি এ দেশের চলচ্চিত্রশিল্পটিকে স্বাধীনতার পর একটি ভিন্ন মাত্রায় নিজের হাতে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৬৯ সালে 'পাকিস্তান ফিল্ম সোসাইটি' থেকে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেছিলেন ফিল্ম সোসাইটি 'ঢাকা সিনে ক্লাব'। মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রই ছিল ধ্বংস-বিধ্বস্ত। এ সময় আধুনিক চলচ্চিত্রে প্রশিক্ষিত আলমগীর কবির দেশের বিধ্বস্ত চলচ্চিত্রশিল্পকে যেন নিজের হাতে গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আধুনিক চলচ্চিত্র নির্মাণের চেয়ে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল চলচ্চিত্রমনস্ক একটি আধুনিক প্রজন্ম গড়ে তোলা। আর তাই স্বাধীন বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তাঁরই হাত ধরে।

২. বর্ণাঢ্য জীবন

আলমগীর কবিরের জন্ম ১৯৩৮ সালে রাঙামাটি জেলায়। তাঁর ডাক নাম ছিল মিন্টু। পৈতৃক বাসস্থান ছিল বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলায়। পিতার চাকরিসূত্রে আলমগীর কবির তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু করেছিলেন তৎকালীন অবিভক্ত ভারতবর্ষের হুগলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। এরপর ১৯৫২ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল এবং ১৯৫৪ সালে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি গ্রহণের পর তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড চলে যান। এ সময় তিনি বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কিছু চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ পান। বিশেষ করে সুইডিশ চলচ্চিত্রকার ইঙ্গমার বার্গম্যানের 'দ্য সেভেনথ সিল' (১৯৫৬) ছবিটি তিনি বেশ কয়েকবার দেখেন। আর এ সময় থেকে তিনি নিজেই চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতি আকৃষ্ট হন।

এ জন্য চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাস, চলচ্চিত্র পরিচালনা এবং চলচ্চিত্রবিষয়ক বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেন।

ছাত্রাবস্থায় ইংল্যান্ডে অবস্থান করেও পুঁজিবাদ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। আলমগীর কবির ইংল্যান্ডের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির খবরের কাগজ 'ডেইলি ওয়ার্কার'-এর প্রতিবেদক হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। ষাটের দশকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সহায়তায় কিউবায় যান এবং সেখানে গেরিলাযুদ্ধের ওপর প্রশিক্ষণ নেন। কমিউনিস্ট দৈনিকের প্রতিবেদক হিসেবে তিনি কিউবার রাষ্ট্রপতি ফিদেল কাস্ত্রোর সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করেছিলেন। আলমগীর কবির প্যালেস্টাইন এবং আলজেরিয়ার স্বাধীনতাযুদ্ধের পক্ষেও কাজ করেছেন। জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কার্যক্রমে তিনি সক্রিয় ছিলেন সব সময়। আলমগীর কবির একসময় লন্ডনে ইস্ট পাকিস্তান হাউস এবং ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট নামের সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন।

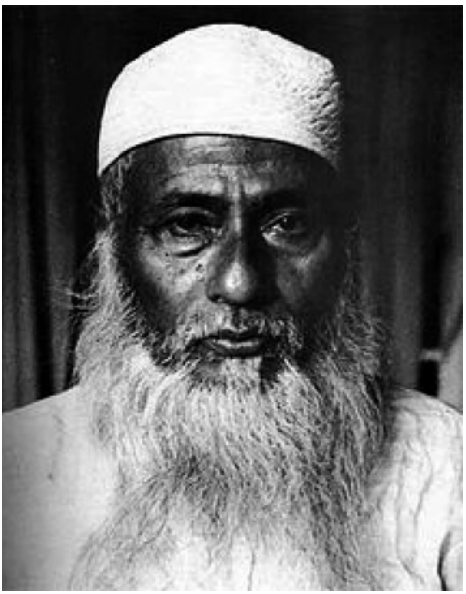

জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

১৯৬৬ সালে আলমগীর কবির দেশে ফিরে আসেন। বামপন্থী আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে তৎকালীন স্বৈরশাসক আইয়ুব সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তবে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব থাকায় সরকার তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি সাংবাদিক হিসেবে তাঁর পেশাজীবন শুরু করেন প্রথমে 'পাকিস্তান অবজারভার', এরপর 'হলিডে' পত্রিকায়। এরপর আলমগীর কবির নিজেই 'দ্য এক্সপ্রেস' নামে একটি পত্রিকা বের করেন। পত্রিকাটি ছিল ট্যাবলয়েড ধাঁচের। ফলে ভিন্ন ধাঁচের এ পত্রিকা পাঠকমহলে বেশ কৌতূহলের জোগান দিয়েছিল। কারণ, ইংল্যান্ডে ট্যাবলয়েড পত্রিকার চল থাকলেও এ দেশে ওই সময়ে তা ছিল একেবারেই নতুন। এদিকে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আলমগীর

কবির একজন চলচ্চিত্রসমালোচক হিসেবেও জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ১৯৭০ সালে প্রত্যক্ষ চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন। এ সময় তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনেও জড়িয়ে পড়েন।

১৯৭১ সালের সেই উত্তাল দিনগুলোতে আলমগীর কবির স্বাধীনতাসংগ্রামের পক্ষেই কাজ করেছেন। ১৯৭১-এর শুরুতেই আলমগীর কবির, জহির রায়হান, শফিক রেহমান ও গাজী শাহাবুদ্দিন যৌথ উদ্যোগে প্রকাশ করেছিলেন 'Express' নামে একটি ত্রৈমাসিক জার্নাল। এই পত্রিকায় আলমগীর কবির নিজের চমৎকার লেখা আর দক্ষ সম্পাদনার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। এই জার্নালটি স্বাধীনতার পরও প্রকাশিত হয়েছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আলমগীর কবির ভারতে গিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ইংরেজি বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগ দেন। 'দিস ইজ রেডিও বাংলাদেশ মুজিবনগর' স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে খাঁটি ব্রিটিশ উচ্চারণে ভেসে আসা তাঁর সেই ভরাট ও চমৎকার কণ্ঠস্বর সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। স্বাধীন বাংলার ওই ইংরেজি অধিবেশনটি ছিল ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের খবর বহির্বিশ্বে পৌঁছানোর এক বড় উৎস। কেবল কণ্ঠস্বর নয়, সংবাদ ও প্রতিবেদন তৈরিতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ইংরেজি বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রবাসী সরকারের প্রধান প্রতিবেদক হিসেবেও দায়িত্ব পেয়েছিলেন। বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আরও নানা ধরনের অনুষ্ঠানের

চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হান

পরিকল্পনাও করেছিলেন। বিদেশি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, কূটনীতিক, রাজনীতিবিদদের বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হতো স্বাধীন বাংলা বেতারে। এ সবকিছুই ছিল তাঁর পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণে। মুক্তিযুদ্ধের এ পর্যায়ে তিনি 'From the War Front' নামে একটা অনুষ্ঠানও শুরু করেছিলেন। একই সাথে সাংবাদিক হিসেবেও কাজ করতেন ইংরেজি সাপ্তাহিক 'People'-এ।

চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের খুবই ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হওয়ায় জহির রায়হানের সাথে সে সময় তাঁর বিভিন্ন রণাঙ্গনে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। যুদ্ধ চলাকালে জহির রায়হান 'স্টপ জেনোসাইড' (১৯৭১) প্রামাণ্যচিত্রটি বানানো শুরু করেছিলেন। এই ছবিতে মূল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছিল। এ ছবির সহকারী পরিচালক ছিলেন আলমগীর কবির। এ সময়ে তাঁর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল বিভিন্ন শরণার্থীশিবিরে ঘুরে ঘুরে জহির রায়হানের সাথে 'Stop Genocide'-এর নির্মাণে অংশগ্রহণ। এ ছবির চিত্রনাট্য এবং ধারাভাষ্য ছিল তাঁরই। এই প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করতে গিয়ে একবার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তাঁরা। স্বাধীনতার বেশ পরে একটি টিভি সাক্ষাৎকারে ঘটনাটি সম্পর্কে আলমগীর কবির নিজেই বলেছিলেন–

'স্টপ জেনোসাইড' তৈরি করতে গিয়ে আমরা যখন মালদা বর্ডারে ছিলাম, তখন পাকিস্তানি একটা ক্যাম্প কাছেই ছিল, তারা আমাদের উড়িয়ে দিতে পারত। আমরা দুজনেই একটা মাইনফিল্ডের ভেতর দিয়ে বেকুবের মতো হেঁটে বেরিয়ে গেছি, আমাদের আগে যারা এ দিক দিয়ে যেতে চেয়েছে, তারা মারা গেছে, আমরা বেঁচে আছি। কাজেই আমার কিন্তু আজ এখানে কথা বলার কথা নয়।...

জহির রায়হান নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র 'স্টপ জেনোসাইড'-এর একটি দৃশ্য

আলমগীর কবির জহির রায়হানের 'A State is Born' (১৯৭১) এবং বাবুল চৌধুরীর 'Innocent Millions' (১৯৭১)-এর নির্মাণে অংশ নেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কথা তুলে ধরে তিনি নিজেই নির্মাণ করেছিলেন 'Liberation Fighters' (১৯৭১) প্রামাণ্যচিত্র। এভাবে তিনি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে তাঁর চিত্রপরিচালক জীবন শুরু করেন। স্বাধীনতাযুদ্ধের পর শুরু করেন পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজ। তাঁর চলচ্চিত্রগুলো সে সময় বেশ সমালোচিত এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে। তবে চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান যখন 'জীবন থেকে নেয়া' (১৯৭০) ছবির কাজ শুরু করেন, তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। ছবিটির শুটিং চলাকালে জহির রায়হানের কাজকর্মের ওপর ভিডিও ধারণ শুরু করেছিলেন। এভাবে তাঁর উদ্যোগেই নির্মিত হয় জহির রায়হানের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র। চলচ্চিত্র হিসেবে এটিই তাঁর প্রথম কাজ।

৩. চলচ্চিত্র কারিগর

তবে স্বাধীনতার পর চলচ্চিত্র নির্মাণের চেয়েও তাঁর চলচ্চিত্র সংসদ গড়ার উদ্যোগটি সে সময়ের তরুণদের আকৃষ্ট করেছিল। তিনি আধুনিক চলচ্চিত্রে প্রশিক্ষিত একটি নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। চলচ্চিত্র আলোচক তারেক আহমেদ যথার্থই বলেছেন–

নির্মাতা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে তাঁর যাত্রা শুরু হলেও সংগঠক আলমগীর কবিরের শুরু ও বিকাশ গেল শতকের ষাটের দশকেই। মূলত বিলেতফেরত আলমগীর কবির সাপ্তাহিক 'হলিডে'তে ফিল্ম ক্রিটিক হিসেবে শুরু করলেও অচিরেই দেশের অগ্রণী চলচ্চিত্র সংসদ 'পাকিস্তান চলচ্চিত্র সংসদে'র নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। কিন্তু যা হয় আরকি, বাঙালির বারোজনের সংগঠনে তেরো রকম মত। তা থেকে মতান্তরে অবশেষে মনান্তর। দুই বছরের মধ্যেই আলমগীর কবির বেরিয়ে এলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন ঢাকা সিনে ক্লাব। পূর্ব পাকিস্তানের দ্বিতীয় চলচ্চিত্র সংসদ। '৬৯ সালে তাঁর সক্রিয় উদ্যোগে চালু হলো 'ঢাকা ফিল্ম ইনস্টিটিউট'। এ দেশে প্রাতিষ্ঠানিক চলচ্চিত্র শিক্ষার প্রথম পদক্ষেপ বলা চলে একে। সিনেমার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় আলমগীর কবিরের এই ভাবনা পরবর্তী সময়ে স্বাধীন দেশে আরো গতি পায়। বলা চলে, হয়তো তাঁর পথ অনুসরণ করেই ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের শিক্ষক সতীশ বাহাদুরকে নিয়ে প্রথমবারের মতো ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সের আয়োজন করে। এই সতীশ বাহাদুরই পরবর্তী সময়ে ১৯৭৭ সালে তাঁর দ্বিতীয়বারের সফরে এলে বাংলাদেশে ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার মূল রূপরেখা দিয়ে যান। পরের বছর

আর্কাইভের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলেও মূলত দেশের চলচ্চিত্রমনস্ক তরুণদের সাথে আর্কাইভের কর্মকাণ্ডের সংযোগ ঘটে, যখন পুনরায় আলমগীর কবিরই সেখানে চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করেন। বাংলাদেশে এখন যাঁরা বিকল্পধারার চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে নন্দিত ও সুপরিচিত, তাঁদের অনেকেরই চলচ্চিত্রের শিক্ষাগুরু ছিলেন আলমগীর কবির। তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ফিল্ম আর্কাইভের কোর্সগুলো থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই পরবর্তী সময়ে তাঁরা নিজেরা চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন।

(নদীর দেশের চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবির, বিডিনিউজ.কম, ২০ জানুয়ারি ২০১৬)

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কোর্সগুলোর শিক্ষার্থীদের জন্য আলমগীর কবির নিজেই যেসব 'লেকচার শিট' তৈরি করেছেন, এককথায় সেগুলো অসাধারণ। নবীন শিক্ষার্থীদের কাছে চলচ্চিত্র যেহেতু সম্পূর্ণ নতুন ও অজানা একটি বিষয়, তাই তাদের উপযোগী করে তিনি 'লেকচার শিট' তৈরি করেছেন। চলচ্চিত্রের ভাষা, শব্দ-সংগীত সবই তিনি তাঁর মতো করে বর্ণনা করেছেন। সাধারণত চলচ্চিত্রের শব্দ ও সংগীত সম্পর্কে বলা হয়–

ছবিতে শব্দের ব্যবহার অনেক রকম হতে পারে। প্রথমত, সংলাপে অভিনেতাদের ও ন্যারেশনে কমেন্টেটরের কণ্ঠস্বর। দ্বিতীয়ত, সংগীতের ভূমিকা দুই প্রকার হতে পারে। বাস্তববাদী– যেমন কেউ হয়তো গান গাইছে, আর ফাংশনাল– যখন সংগীত ইমেজে অতিরিক্ত কিছু আরোপ করে...সংগীতের এরূপ প্রয়োগ চলচ্চিত্রের প্রকাশযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়, বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে, পরিচালকের অনুভূতি ও মনোভাব ব্যক্ত করে। এই সংগীতদৃশ্যের শুধুই সঙ্গী না থেকে ছবির নাটকীয় সংগঠনেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তা অনেকভাবে সম্ভব। প্রথমত সংগীত অ্যাকশনে অতিরিক্ত মাত্রা এনে দিতে পারে।

(শব্দ ও সঙ্গীত, চলচ্চিত্রের অভিধান, ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৮১)

চলচ্চিত্রে শব্দ ও সংগীতের ব্যবহার সম্পর্কে আলমগীর কবির খুব সহজ ভাষায় তাঁর শিক্ষার্থীদের জন্য 'লেকচার শিট' তৈরি করেছেন। চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক কুমার ঘটকের আলোচিত ছবি 'মেঘে ঢাকা তারা'র একটি বিশেষ অংশ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। চলচ্চিত্রের গানের শট বিভাজনও শিক্ষার্থীদের বুঝিয়েছেন তাঁর অপূর্ব ব্যাখ্যায়–

টকি সিনেমাতে শব্দ বলতে প্রথমেই বুঝি সংলাপ। সংলাপের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে তথ্য পরিবেশন করা। সংলাপের সাহায্যে গল্পের অগ্রগতি, অর্থাৎ গল্প যে এগোচ্ছে, সেটা দর্শক বুঝতে পারেন। সংলাপ থেকে একটি চরিত্রের বাহ্য প্রকৃতি ও মানসিক চিন্তাধারা ফুটে ওঠে। সংলাপের সাহায্যে নাটকীয় মুহূর্তও সৃষ্টি করা যায়। সংলাপের মাধ্যমে একটি চরিত্রের পূর্ণ রূপ প্রকাশ করা যায় এবং পরিচালকের বক্তব্যও পরিষ্কার হয়। সংলাপের মতো গানও চরিত্রের মনের ভাব, পরিবেশের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি প্রকাশ করতে সাহায্য করে।...ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে শঙ্কর ও নীতার দ্বৈত সংগীত এর দৃষ্টান্ত। এর প্রয়োগ যেমন নাটকীয় তেমনি মনস্তাত্ত্বিক।...

শট-১ : ক্লোজ শট শঙ্কর রবীন্দ্রসংগীত গাইছে–
যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে
জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে।
যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে

শট-২ : ক্লোজ শট থেকে লং শট সব যে হয়ে গেল কালো
নিভে গেল দীপের আলো
সব যে হয়ে গেল কালো
নিভে গেল দীপের আলো–

ক্যামেরা আস্তে আস্তে পেছনে চলতে চলতে শেষে নীতাকে দেখা গেল বসে আছে।

আকাশ পানে হাত বাড়ালেম
কাহারও তরে
জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে
যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে
অন্ধকারে রইনু পড়ে স্বপন মানি–
ঝড় যে তোমার জয়-ধ্বজা তাই কি জানি
শঙ্কর ও নীতা গাইছে–
অন্ধকারে রইনু পড়ে স্বপন মানি–
ঝড় যে তোমার জয়-ধ্বজা তাই কি জানি
এবার ক্যামেরা সামনের দিকে এগোতে থাকে

দুজনে গাইছে–

সকাল বেলায় চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে আছ
তুমি এ কি!

*নীতা একা গাইছে–*সকাল বেলায় চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে আছ
তুমি এ কি!

শট-৩ : ক্লোজ শট *নীতা গুনগুন করছে। তার ওপর শোনা গেল শঙ্করের গলা*

ঘর ভরা মোর শূন্যতারই বুকের 'পরে।

শট-৪ : ক্লোজ শট *শঙ্কর গাইছে*

জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে–

শট-৫ : ক্লোজ শট *নীতা গাইছে*

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল....

শট-৬ : মিড শট *নীতা ঝর ঝর করে কেঁদে ভেঙে পড়ল।*

ফেড আউট

শট বিভাগের মধ্যে দারুণ সংযম ও মিতব্যয়িতা আছে যা সহজেই লক্ষ করা যায়। এই গানটিতে মাত্র পাঁচটি শট। ২ নং শট ছাড়া অন্য কোনো মুভমেন্ট নেই– সম্পূর্ণ স্থির, চরিত্র দুটি এক জাগায় বসে আছে– ক্যামেরাও নড়েচড়ে না। শুধু ২ নং শটে ক্যামেরা ক্লোজ থেকে ধীরে ধীরে লং শটে গিয়ে নীতাকে ফ্রেমের মধ্যে নিয়ে এল। আবার ক্যামেরা এগোতে এগোতে ক্লোজে গিয়ে নীতার ওপর স্থির হয়ে দাঁড়াল। এই রকম স্থির, মুভমেন্ট-বিহীন শটগুলি দর্শকের মনকে দারুণ নাড়া দেয়– চরিত্র দুটির মনের কথা দর্শক বুঝে নিতে পারে। কম্পোজিশনগুলি একটা হতাশা–একটা ভেঙে যাওয়া ক্ষতবিক্ষত মনের যন্ত্রণা প্রকাশ করে। দরমার বেড়ার ভিতর দিয়ে টুকরো টুকরো আলোর রশ্মি যেন একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা সৃষ্টি করে–কোনো আলো নেই–কোনো আশা নেই–আগামী দিন অন্ধকার। ২ নং শটটি একটু নিচু থেকে নেওয়া হয়েছে বলে ঘরের চালের কিছু অংশও দেখা যায়–অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শট–ঐ একটি শটের মারফত শ্রীঘটক সমস্ত পরিবেশটিকে তুলে ধরেছেন। কোথাও এতটুকু বাহুল্য নেই–সব কটা শট যেন নিক্তিতে ওজন করে যথাযথ জায়গায় বসানো হয়েছে। এককথায় অপূর্ব!

(Film Appreciation Course Matterials, Session: August-December 1984)

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ পরিচালিত ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স পরিচালনা করতে গিয়ে আলমগীর কবির তাঁর শিক্ষার্থীদের চলচ্চিত্রের ইতিহাস, নির্মাণকৌশল, ডিটেইলস, এমনকি চিত্রসমালোচনার পদ্ধতি সম্পর্কেও ধারণা দিয়েছেন। তাঁর নিজের লেখা প্রতিটি 'লেকচার শিট' চলচ্চিত্রের শিক্ষার্থীদের জন্য অবশ্যপাঠ্য–

Critical Appreciation

The first film *Mukh-O-Mukhosh* (1956) had no artistic ambition or pretention. The only point its maker wanted to make was this that it was possible to make full-length feature films here, relying wholly on local talent. The film, admittedly shoddy in production quality, proved an instant favourite with the audiences hinting at a reliable home market for home products.

(Film Appreciation Course Matterials, Session: August-December 1984)

৪. চলচ্চিত্রের অনন্য রূপকার

ধীরে বহে মেঘনা চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য

স্বাধীনতার পর আলমগীর কবির নির্মাণ করেন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'ধীরে বহে মেঘনা' (১৯৭৩)। এটি তাঁর পরিচালিত প্রথম ফিচার চলচ্চিত্র। ছবিটি ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত। তবে এই চলচ্চিত্রটির নির্মাণশৈলী বাংলাদেশে নির্মিত যেকোনো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ ছবিতে তিনি মুক্তিযুদ্ধের ফুটেজ ও ফিকশন, যেমন মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ, মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধযাত্রা, ১৬ ডিসেম্বর ট্রাকভর্তি মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি এবং ঘরে ফেরার দৃশ্য ইত্যাদি। এই চলচ্চিত্রের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি বাচসাস পুরস্কার এবং জহির রায়হান চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। এটি ছিল আলমগীর কবিরের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। তবে 'ধীরে বহে মেঘনা'র (১৯৭৩) মূল

পরিকল্পনাকারী ছিলেন চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান। ১৯৭২ সালে তাঁর নিরুদ্দেশ হওয়ার পর আলমগীর কবির নিজেই ছবিটি নির্মাণের দায়িত্ব নেন।

সূর্যকন্যা চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য

এরপর নির্মাণ করেন দ্বিতীয় পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'সূর্যকন্যা' (১৯৭৫)। এই চলচ্চিত্রে আলমগীর কবির ব্যক্তি, সমাজ ও ইতিহাসে নারীর সাহসী অবস্থান উপস্থাপন করেছেন। এই চলচ্চিত্রের দক্ষ নির্মাণশৈলীর জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। এ ছাড়া পান জহির রায়হান চলচ্চিত্র পুরস্কার। এই ছবির কাহিনি, চরিত্র, গান, সংলাপ–সবই ছিল চমৎকার ও ব্যতিক্রমী। কাহিনিটি ছিল এক কল্পনাপ্রবণ শিল্পী ভাস্করকে নিয়ে, যে নিজের তৈরি এক নারীমূর্তির প্রেমে পড়ে। এভাবে বাস্তবতা আর কল্পনার মিশ্রণে কাহিনি এগিয়ে যায়। এ ছবিতে এক দৃশ্যে আলমগীর কবির অ্যানিমেশনের সাহায্যে কিছু প্রতীকী দৃশ্য দেখিয়েছেন, যা ওই সময়ে সম্পূর্ণ এক নতুন ব্যাপার ছিল। সংগীত পরিচালক সত্য সাহার সুরে ছবিটির দুটি গান 'আমি যে আঁধারে বন্দিনী' এবং 'চেনা চেনা লাগে তবু অচেনা' ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। গান দুটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন যথাক্রমে গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং শ্যামল মিত্র। 'সূর্যকন্যা' (১৯৭৫) ছবির চিত্রনাট্যের একটি অংশ :

SEQ VII/Scene I

Shot-1 Mise-en-scene LS

Robin Gomez & Monica inside shop.

Shot-1A C.S. Robin

Robin deeply engrossed in writing the cash book.

Shot-1B C.S. Monica. Dolly shot FS C.S.

As camera dollies nearer Monica it will be revealed that she is reading 'Valley of the Dolls.'

Shot-2 L.S. Shop interior.

A young couple enter. R & M become attentive the girl approaches Monica saying: একটা আংটি দেখান তো।

Meanwhile the man approaches Robin.

Shot-3 MS composite. Eqalpref: Robin & Suman
Robin: Yes, what can I do for you, Sir?

Suman: একটা কথা ছিল।

Robin: বলুন (He takes off his glasses)

Suman: (Looking around sheepishly) একটু গোপন।

Robin nods with comical understanding.

(চিত্রনাট্য : ধীরে বহে মেঘনা, সূর্যকন্যা, সীমানা পেরিয়ে, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি)

গতানুগতিক বাণিজ্যিক ছবি থেকে 'সূর্যকন্যা' (১৯৭৫) ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ধাঁচের। এই ছবিটি সে সময় বাণিজ্যিক সফলতা ও সমালোচকদের উচ্চ প্রশংসা দুটোই পেয়েছিল। এ ছবিতে নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন বুলবুল আহমেদ। এ ছবির নায়ক লেনিন চৌধুরী একজন ভাস্কর ও কল্পনাপ্রবণ। তার চরিত্রটি অভিনেতা বুলবুল আহমেদ সার্থকভাবেই পর্দায় তুলে ধরেছিলেন। কারণ, লেনিন চৌধুরী বাণিজ্যিক ধারার ফর্মুলা নায়কদের মতো নন। তিনি মারপিট জানেন না, পরীক্ষায় প্রথম হন না কিংবা গান গাইতে বা নাচতেও জানেন না। তিনি একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণ, যিনি স্বপ্ন দেখেন সমাজতন্ত্র ও নারী অধিকারের। এ ধরনের একটি চরিত্র চিত্রায়ণের জন্য আলমগীর কবিরের একজন পরিশীলিত ব্যক্তিত্বের অভিনেতার প্রয়োজন ছিল। শিল্পী বুলবুল আহমদ যথাযথভাবেই চরিত্রের সেই দাবি পূরণ করেছিলেন। ছবিটি মুক্তি লাভের পর বুলবুল আহমেদ বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে তারকাখ্যাতি লাভ করেছিলেন। চলচ্চিত্রসমালোচক ফাহমিদা আক্তার এ ছবির সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন–

'সূর্যকন্যা' আলমগীর কবিরের দ্বিতীয় কাহিনিচিত্র। প্রথম ছবির মতো এ ছবিতেও আলমগীর কবির মগ্ন থেকেছেন চলচ্চিত্রমাধ্যমের সম্ভাবনাকে নানা মাত্রায় প্রকাশের নিরীক্ষায়। প্রচলিত গল্প বলার স্টাইলকে ভেঙে নিম্নমধ্যবিত্তের অদ্ভুত বিষণ্নতা আর মনোজগতের ভাষাকে চলচ্চিত্রের ফ্রেমে আলমগীর কবির নিয়ে এসেছেন ফরাসি 'ন্যুভেল ভাগ' পরিচালকের স্বভাবে। নিজের লেখা কাহিনি ও চিত্রনাট্যে সিনেমার প্রকরণকে ভেঙেছেন, গড়েছেন দ্বান্দ্বিকতা আর আঁদ্রে বাঁজা কথিত personal factor চিত্রণের অনুষঙ্গে। ...'সূর্যকন্যা' মূলত প্রচলিত বাংলা ছবির idiological ডিসকোর্সে এক ভিন্ন সিনেমাভাষ্য। এ ছবিতে এদেশীয় নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা আর অন্তর্ভেদী অবচেতনের দ্বান্দ্বিকতায় আলমগীর কবিরের ধ্রুপদি চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রয়াস স্পষ্ট। ব্যর্থতা যা-ই থাক না কেন, এ ছবিতে কবিরের প্রত্যক্ষণজাত সমকালীন বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা আর বুভুক্ষু অবচেতনের আকাঙ্ক্ষামালা হাজির হয়েছে আবেগময় চলচ্চিত্রিক ব্যঞ্জনায়। আর চলচ্চিত্রের শরীরে অধরা মনস্তত্ত্বের এই রূপায়ণে আজও এ ছবি বাংলা ছবির ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন ও দৃষ্টান্ততুল্য চলচ্চিত্র।

(সূর্যকন্যা : মধ্যবিত্তের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা, ফাহমিদা আক্তার, শিল্প ও শিল্পী, ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২৫, অক্টোবর ২০১৮)

আলমগীর কবিরের তৃতীয় পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'সীমানা পেরিয়ে' (১৯৭৭)। মূলত ১৯৭০-এর ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের একটি সত্যি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি এই ছবিটি নির্মাণ করেছিলেন। সে সময় এই জলোচ্ছ্বাসের ভয়ংকর তাণ্ডবের প্রায় তিন মাস পর একজোড়া মানব-মানবীকে বরিশালের দক্ষিণের একটি সামুদ্রিক চরে আদিম পরিস্থিতিতে কোনো রকমে বেঁচে থাকতে দেখা গিয়েছিল। তৎকালীন সংবাদপত্রে ঘটনাটির বিবরণ আলমগীর কবিরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি এর বেশ

সীমানা পেরিয়ে চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য

কয়েক বছর পর এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন। এই চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য তিনি পান শ্রেষ্ঠ সংলাপ ও চিত্রনাট্য রচয়িতা হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। এ ছবির সংগীত পরিচালনা ও গীত রচনা করেছেন উপমহাদেশের কিংবদন্তিতুল্য সুরস্রষ্টা ভূপেন হাজারিকা। তাঁর কণ্ঠেই অনবদ্য সৃষ্টি 'মেঘ থম থম করে'। এ ছবির আরেকটি গান তাঁর কথা ও সুরে 'বিমূর্ত এই রাত্রি আমার' গেয়েছেন কণ্ঠশিল্পী আবিদা সুলতানা। এই গান দুটি বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম সেরা গান হিসেবে আজও সমাদৃত।

'রূপালী সৈকতে' (১৯৭৯) আলমগীর কবিরের চতুর্থ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। ইংরেজিতে এ ছবির নাম দেওয়া হয়েছে *The Silver Beach*। এই ছবিটিও সে সময় দারুণ আলোচিত হয়েছিল। এই চলচ্চিত্রটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি পুরস্কার (বাচসাস) অর্জনের মর্যাদা লাভ করে। এরপর নির্মাণ করেন 'মোহনা' (১৯৮২)। এটি তাঁর পরিচালিত পঞ্চম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য রচয়িতার পুরস্কার পান। ছবিটি আন্তর্জাতিকভাবেও প্রশংসিত হয়। ১৯৮২ সালের মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এই ছবি ডিপ্লোমা অব মেরিট লাভ করে। সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণেও আলমগীর কবির তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর ষষ্ঠ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'পরিণীতা' (১৯৮৪)। অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত এই ছবিটি সে সময় দারুণভাবে আলোচিত ও প্রশংসিত হয়েছিল। এটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত হয়। এর পরের বছর আলমগীর কবির নির্মাণ করেন তাঁর সপ্তম ও সর্বশেষ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'মহানায়ক' (১৯৮৫)। ছবিটি প্রযোজনা করেন চিত্রনায়ক বুলবুল আহমেদ। এক বেকার যুবকের রোমাঞ্চকর প্রেমের গল্প নিয়ে ছবিটি নির্মিত হয়েছে। এই চলচ্চিত্রে গীতিকার মাসুদ করিমের কথা আর সংগীত পরিচালক শেখ সাদী খানের সুরে কণ্ঠশিল্পী সুবীর নন্দীর গাওয়া 'আমার এ দুটি চোখ পাথর তো নয়' আধুনিক বাংলা গান হিসেবে এখনো জনপ্রিয়।

চলচ্চিত্রে যদি ব্যবসার কথা বলতে হয়, তবে বলতেই হবে–আলমগীর কবির ব্যবসাসফল ছবির নির্মাতা ছিলেন না। অবশ্য বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' (১৯৫৫) নির্মাণের বেলায় একই ঘটনা ঘটেছিল। প্রথম দিকে দর্শক এই ছবিটির ব্যাপারে কোনো আগ্রহই দেখাননি। পরে দেশ-বিদেশের

পুরস্কার আর সমালোচকদের প্রশংসায় ছবিটি ব্যবসাসফল হয়েছিল। আবার ব্যবসাসফল হলেই কি তাকে ভালো ছবি বলা যাবে? এ প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায় নিজেই বলেছেন–

ভালো ছবি কাকে বলে? ভালো গল্প মানেই কি ভালো ছবি? অনেককেই এমন কথা বলতে শুনেছি। কিন্তু তাই যদি হবে, তাহলে বাংলাদেশের ছবির ইতিহাসে ভালো ছবির এত অভাব হলো কেন? বাল্মীকি বেদব্যাস থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের সেরা সাহিত্যিকদের কত ভালো গল্পই তো ছবি হয়ে দেখা দিয়েছে। কাহিনির দৈন্য তো সেখানে ছিল না। তবে কিসের দৈন্য, কিসের অভাব তাঁদের শিল্প-সাফল্য থেকে বঞ্চিত করল? আসলে কাহিনি মাত্রেরই দুই দিক আছে–এক হলো তার বক্তব্য, আর এক হলো তার ভাষা। এই দুয়ে মিলে গল্প। গল্পের আর্ট এই বলার ভঙ্গিতে। ভালো গল্প বলার দোষে নষ্ট হয়ে যায়, সামান্য কাহিনি বলার গুণে শিল্পমণ্ডিত হয়ে ওঠে। চলচ্চিত্রশিল্পও তার ভাষায়, তার বিন্যাসকৌশলে। যেখানে ভাষা দুর্বল, সেখানে গল্প ভালো হলেও ছবি শিল্প-সাফল্য লাভ করতে অক্ষম। চলচ্চিত্রের এই ভাষা ছবির ভাষা। পরিচালককে এই ভাষা জানতে হবে, এর ব্যাকরণ তাঁকে আয়ত্ত করতে হবে।

(বিষয় চলচ্চিত্র, সত্যজিৎ রায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা)

তৎকালীন এ দেশের অন্যতম চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আলমগীর পিকচার্স লিমিটেড আলমগীর কবির নির্মিত 'সূর্যকন্যা' (১৯৭৫) এবং 'সীমানা পেরিয়ে' (১৯৭৭) প্রযোজনা করেছিল। আলমগীর পিকচার্স লিমিটেডের কর্ণধার এ দেশের অন্যতম চিত্র প্রযোজক এ কে এম জাহাঙ্গীর খান জানতেন, এসব ছবি ব্যবসাসফল হবে না। তারপরও ভালো ছবির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। সংবাদপত্রে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন–

আলমগীর কবির শিক্ষিত লোক। আমাদের দেশের সবচেয়ে নামকরা পরিচালক জহির রায়হানের সহকারী ছিলেন। সাংবাদিকও ছিলেন। লন্ডন থেকে বোধ হয় ফটোগ্রাফি ও ডিরেকশনের ওপর পড়ালেখা করে এসেছিলেন কিন্তু তিনি ফিল্ম ব্যবসা বুঝতে পারেননি। তাঁর কোনো ছবিই ব্যবসা করেনি, কিন্তু তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। 'সূর্যকন্যা', 'সীমানা পেরিয়ে' করে তিনি প্রশংসাই পেয়েছেন। তিনি ভালো পরিচালক, যুগ যুগ ধরে, যত দিন আমাদের চলচ্চিত্রশিল্প থাকবে, তাঁর 'সূর্যকন্যা', 'সীমানা পেরিয়ে' ২০-৩০ বছর পরও মনে হবে নতুন ছবি,

নতুন আঙ্গিকের ছবি।...তাঁর প্রথম ছবিটি ছিল 'ধীরে বহে মেঘনা'। এই ছবিটি তিনি স্টারের (ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউশন) ব্যানারে করেছিলেন। এটি ১৯৭৩ সালে মুক্তি পায়। এই ছবিটি ফ্লপ করার পর তিনি প্রযোজক পাচ্ছিলেন না। 'সূর্যকন্যা' নিজেই প্রযোজনা শুরু করে জয়শ্রী কবিরকে কলকাতা থেকে আনলেন। এরপর প্রযোজকের জন্য অনেক জায়গায় গেলেন। তাঁরা বললেন, ভাই, এসব ছবি আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করতে পারি না। কারণ, সাধারণ দর্শক এগুলো দেখবে না, কিন্তু আপনি সুনাম পাবেন। এই ছবি করে ব্যবসায়িকভাবে আপনি কষ্টই পাবেন। পরে বললাম, ঠিক আছে, আমি ফাইন্যান্স করব। এই ছবির মাধ্যমে আপনার নাম হলে আমারও নাম হবে। তারপর আমার কথাই ঠিক হলো। ছবিটি প্রশংসিত হলো, কিন্তু পয়সা পেল না।...

(দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৫ নভেম্বর ২০১৬)

৫. নির্মাণের দক্ষ কারিগর

আলমগীর কবির নতুন ধারার বেশ কিছু চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান, অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে সেসব উদ্যোগের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। ১৯৮৬ সালে তিনি কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক 'হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাস অবলম্বনে 'রূপসী মা' ছবির চিত্রায়ণ শুরু করেছিলেন। তবে একপর্যায়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় চিকিৎসার জন্য লন্ডনে চলে যান। ফলে সেই ছবিটির নির্মাণকাজ আর শেষ করতে পারেননি। তবে এরপর জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের (NIMCO) সহযোগিতায় এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয় 'চোরাস্রোত' (১৯৮৮) ছবিটি। একই সাথে সমকালীন সময় ও রাজনীতিবিষয়ক 'মণিকাঞ্চন' (১৯৮৮) স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। ১৯৮৮ সালে বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। সে বছরেরই শেষ দিকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই উৎসবের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর তরুণ সহযোগীদের জন্য বিকল্পধারার চলচ্চিত্র নির্মাণের এক উল্লেখযোগ্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেন। আলমগীর কবির তাঁর দেড় যুগের চলচ্চিত্র জীবনে মোট সাতটি পূর্ণদৈর্ঘ্য এবং নয়টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। ছবিগুলো হচ্ছে–

পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

ধীরে বহে মেঘনা–১৯৭৩

সূর্যকন্যা–১৯৭৫

সীমানা পেরিয়ে–১৯৭৭

রূপালী সৈকতে–১৯৭৯

মোহনা–১৯৮২

পরিণীতা–১৯৮৪

মহানায়ক–১৯৮৫

স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

Liberation Fighter

Pogrom in Bangladesh

Culture in Bangladesh (চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের জন্য নির্মিত)

সুফিয়া (চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের জন্য নির্মিত)

অমূল্য ধন (World View International Foundation-এর জন্য নির্মিত)

ভোর হলো দোর খোল (World View International Foundation-এর জন্য নির্মিত)

আমরা দুজন (World View International Foundation-এর জন্য নির্মিত)

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে

মণিকাঞ্চন

চোরাস্রোত (জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট আয়োজিত ওয়ার্কশপের চলচ্চিত্র)

জয়নুল আবেদিন (চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের জন্য নির্মিত)

মওলানা ভাসানী (অসমাপ্ত)

পটুয়া (অসমাপ্ত) পটুয়া কামরুল হাসানের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র

পুরস্কার ও সম্মাননা

শিল্পকলায় অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আলমগীর কবিরকে ২০১০ সালে মরণোত্তর 'স্বাধীনতা পুরস্কার' প্রদান করা হয়। এটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ

বেসামরিক পুরস্কার হিসেবে পরিচিত। এ ছাড়া তিনি পেয়েছেন–'ধীরে বহে মেঘনা'র (১৯৭৩) জন্য 'সিনে জার্নালিস্ট পুরস্কার', 'ধীরে বহে মেঘনা' (১৯৭৩) ও 'সূর্যকন্যা'র (১৯৭৫) জন্য 'জহির রায়হান উত্তরণ চলচ্চিত্র পুরস্কার', সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ পুরস্কার'। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও পেয়েছেন একাধিকবার। 'সূর্যকন্যা' (১৯৭৫) ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক ও শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকারের পুরস্কার। 'সীমানা পেরিয়ে' ১৯৭৭) ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার ও শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতার পুরস্কার। 'মোহনা' (১৯৮২) ছবির জন্য রাশিয়ার মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব থেকে পান ডিপ্লোমা অব মেরিট, 'পরিণীতা' (১৯৮৬) ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে পুরস্কার। ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের 'বাংলাদেশের সেরা ১০ চলচ্চিত্র' তালিকায় আলমগীর কবিরের তিনটি চলচ্চিত্র স্থান পেয়েছে। ছবিগুলো হচ্ছে 'ধীরে বহে মেঘনা' (১৯৭৩), 'সীমানা পেরিয়ে' (১৯৭৭) ও 'রূপালী সৈকতে' (১৯৭৯)।

৬. চিরকালের কুশলী নির্মাতা

১৯৬৮ সালে আলমগীর কবির মঞ্জুরা বেগমকে বিয়ে করেন। কিন্তু তাঁর সাথে বিবাহবিচ্ছেদের পর ১৯৭৫ সালে অভিনেত্রী জয়শ্রী রায়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। জয়শ্রী রায় আলমগীর কবিরের 'সূর্যকন্যা' (১৯৭৫) ছবিতে অভিনয়ের জন্য ভারত থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। পরে তিনি আলমগীর কবিরকে বিয়ে করে জয়শ্রী কবির নামে পরিচিত হন। ব্যক্তিগত জীবনে আলমগীর কবির তিন কন্যার জনক। বগুড়া জেলায় একটি চলচ্চিত্রবিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ঢাকা ফিরে আসার পথে ১৯৮৯ সালের ২০ জানুয়ারি, নগরবাড়ী ফেরিঘাটে এক মারাত্মক দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন।

আলমগীর কবির নিজেকে একজন চলচ্চিত্রকার ভাবার চেয়ে চলচ্চিত্রের কর্মী ভাবতেই বেশি ভালোবাসতেন। এ জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণের পাশাপাশি চলচ্চিত্র-আলোচনা, চলচ্চিত্র-সংগঠন এবং চলচ্চিত্র-অধ্যয়ন ও অনুশীলনেই নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন সব সময়। আলমগীর কবিরের চলচ্চিত্র নিয়ে আগেও যেমন আলোচনা হয়েছে, তেমনি এখনো হয়। এ দেশের চলচ্চিত্র মূল্যায়নের যেকোনো প্রেক্ষাপটে তিনি অনিবার্যভাবে এসে হাজির হন। তাঁর চলচ্চিত্র এখন গবেষণার বিষয়। আলমগীর কবিরের চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ড. নাদির জুনাইদ মন্তব্য করেছেন–

বাংলাদেশে এই পর্যন্ত নির্মিত বিকল্পধারার চলচ্চিত্রের নির্মাণশৈলীর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, ১৯৭০-এর দশকে নিজের বিভিন্ন ছবিতে আলমগীর কবির সচেতনভাবে নতুন এবং উদ্ভাবনী চলচ্চিত্রকৌশল ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। তার 'ধীরে বহে মেঘনা' (১৯৭৩), 'সূর্যকন্যা' (১৯৭৬), 'রূপালী সৈকতে' (১৯৭৯) ছবিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ আর সমালোচনা যেভাবে অভিনব ও পরীক্ষামূলক নির্মাণশৈলীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে, তেমন প্রচেষ্টা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে বিরল। নিজের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি 'ধীরে বহে মেঘনা'য় কবির ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন ডকুমেন্টারি দৃশ্য, ছবির চরিত্রদের ভাবনা শোনানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ইন্টারনাল মনোলোগ, কখনো ভয়েস ওভারের মাধ্যমে বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। এই ছবিতে চরিত্রদের কথোপকথন নিছক সংলাপ থাকে না, তা হয়ে ওঠে বার্তা এবং প্রকাশ করে পরিচালকের রাজনৈতিক অবস্থান।

(বাংলাদেশের চিন্তাশীল ছবির নির্মাণশৈলী, ড. নাদির জুনাইদ, ক্যানভাস, মে ১৮, ২০১৮)

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আলমগীর কবির এ দেশে একটি চলচ্চিত্র আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। তাঁর আদর্শেই পরবর্তী সময়ে এই ধারা অব্যাহত রেখেছেন তানভীর মোকাম্মেল, তারেক মাসুদ, মোরশেদুল ইসলাম প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই আলমগীর কবিরের গড়া 'ঢাকা ফিল্ম ইনস্টিটিউট' এবং 'বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ'-এর 'ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন' কোর্সের ছাত্র ছিলেন। ১৯৭৪ সালে আলমগীর কবির দেশের চলচ্চিত্র সংসদগুলো একত্র করে 'বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ' গড়ে তুলেছিলেন। তিনি এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ও ইনস্টিটিউটে চলচ্চিত্রবিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হলে তিনি সেই কোর্সের সমন্বয়কারী নিযুক্ত হন এবং প্রধান প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। সে বছর ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'-এর স্মরণিকাও প্রকাশ হয় তাঁর সম্পাদনায়। আলমগীর কবির চলচ্চিত্র সমালোচনাও লিখেছেন অনেক দিন ধরে। চলচ্চিত্রবিষয়ক কিছু বইও লিখেছেন, যেমন 'Cinema in Pakistan' (১৯৬৯), 'Film in Bangladesh' (১৯৭৯)। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলো নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সব লেখাই ইংরেজিতে,

ফলে এসব লেখা বাঙালি পাঠকদের চোখের আড়ালেই রয়ে গেছে। তবে আশার কথা, কয়েকজন উৎসাহী গবেষক তাঁর এসব লেখা বাংলায় অনুবাদ ও সংকলন করার উদ্যোগ নিয়েছেন। ইতিমধ্যে আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান ও প্রিয়ম প্রীতিম পাল সম্পাদিত 'চলচ্চিত্র ও জাতীয় মুক্তি : আলমগীর কবির রচনা সংগ্রহ-১' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। চলচ্চিত্র ও জাতীয় মুক্তি এই দুই ক্ষেত্রেই আলমগীর কবিরের অবদান অপরিসীম। গ্রন্থটিতে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে আলমগীর কবিরের চলচ্চিত্রভাবনা এবং জাতীয় মুক্তি-ভাবনারও কথা রয়েছে।

এভাবে নতুন নতুন আলোচনা, গবেষণা ও প্রকাশনার মধ্য দিয়েই আলমগীর কবির চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষের মন চিরজাগরূক থাকবেন। আধুনিক চলচ্চিত্র নির্মাণে তাঁর পথ অনুসরণ করে এ যুগের নির্মাতারা হয়তো আগামী দিনে চলচ্চিত্রের এক সোনালি যুগ রচনা করবেন।

লেখক পরিচিতি : **শ্যামল দত্ত**, চলচ্চিত্র নির্মাতা, চিত্রনাট্য রচয়িতা ও চলচ্চিত্র সমালোচক।

তথ্যসূত্র

চলচ্চিত্রের অভিধান, ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত, বাণীশিল্প কলকাতা, অক্টোবর ১৯৮১

বাংলা চলচ্চিত্রের আর্টের দিক, বিষয় চলচ্চিত্র, সত্যজিৎ রায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

চিত্রনাট্য : ধীরে বহে মেঘনা, সূর্যকন্যা, সীমানা পেরিয়ে, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, জুন, ১৯৭৯

আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান ও প্রিয়ম প্রীতিম পাল সম্পাদিত 'চলচ্চিত্র ও জাতীয় মুক্তি : আলমগীর কবির রচনা সংগ্রহ-১', আগামী প্রকাশনী ও মধুপোক, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৮

আলমগীর কবিরের ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা, ২০ জানুয়ারি ২০১৪

নদীর দেশের চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবির, তারেক আহমেদ, বিডিনিউজ.কম ২০ জানুয়ারি ২০১৬

ফিল্ম সেক্টরটি হলো ভাগ্য, কথায় কথায়, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৫ নভেম্বর ২০১৬

বাংলাদেশের চিন্তাশীল ছবির নির্মাণশৈলী, ড. নাদির জুনাইদ, ক্যানভাস, মে ১৮, ২০১৮

Film Appreciation Course Matterials, Session: August-December 1984

প্রাসঙ্গিক সাহিত্য ভাবনায় আবুল মনসুর আহমদ

বিনয় দত্ত

১.

আবুল মনসুর আহমদ

অন্ধকার, কুসংস্কারের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি নিজের শক্ত অবস্থানকে সব সময় সোচ্চার রেখেছেন। সত্য প্রকাশে কখনো কুণ্ঠাবোধ করেননি, অন্যায়ের সাথে কখনো করেননি আপস, তিনি মহান একজন ব্যক্তি। তাঁর পরিচয়ও একাধিক। অসম্ভব গুণী এই ব্যক্তি বিবেকবোধের সাম্রাজ্যে যশস্বী। বলছিলাম প্রতিভাবান সাহিত্যিক, সম্পাদক, খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, আইনজীবী ও প্রথিতযশা সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদের কথা।

একাধিক পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার পর যেকোনো ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট পরিচয়ে স্বীয় হওয়ার কথা থাকলেও আবুল মনসুর আহমদের বেলায় তা হয়নি। বরং তিনি প্রতিটা পরিচয়ে এত ঋদ্ধ যে তাঁকে আলাদা আলাদাভাবে পরিচিত করার জন্য বহু লেখাই লেখা যায়। মজার ব্যাপার হলো, প্রতিটি অবস্থানে তিনি বীরদর্পে বিরাজ করেছেন। এর মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পরিচয় সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধ পরিচয়ের ভেতর থেকে আজ আমরা তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়ে দৃষ্টিপাত করব। দেখাতে চেষ্টা করব একজন সাহিত্যিক

কীভাবে সমাজের কুসংস্কার, সমাজের ভণ্ডামি সাহিত্যের ছন্দে-আনন্দে তুলে ধরে সমাজকে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছেন, চেয়েছেন নতুন এক সমাজ উপহার দিতে।

মহান এই ব্যক্তির জন্ম ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহের ধানীখোলা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম আবদুর রহিম ফরায়জী এবং মাতার নাম মীর জাহান বেগম। নাসিরাবাদ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক এবং ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে আইএ পাস করার পর তিনি ঢাকা কলেজ থেকে বিএ এবং বাংলার প্রাচীনতম কলকাতা রিপন কলেজ থেকে বিএল পাস করেন। তৎকালীন ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড রিপনের নামানুসারে এই কলেজের নামকরণ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ১৯৪৮-১৯৪৯ শিক্ষাবর্ষে কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে নামাঙ্কিত করা হয় 'সুরেন্দ্রনাথ কলেজ'। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং ভারত তথা সুপ্রিম কোর্টের প্রথম বাঙালি প্রধান বিচারপতি বিজন কুমার মুখার্জি এই আইন কলেজের ছাত্র ছিলেন। এই রকম নামীদামি কলেজ থেকে আবুল মনসুর আহমদ পড়াশোনা করেছেন, নিঃসন্দেহে তিনি একজন মেধাবী ব্যক্তি ছিলেন।

আইন পেশায় নিজেকে থিতু করার জন্য তিনি ময়মনসিংহে আইনব্যবসা শুরু করেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ময়মনসিংহে এই পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। আইনজীবী হিসেবে তাঁর নামটি বেশ সুপ্রিয়। আইন পেশার পাশাপাশি তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ নেন। পরিণত জীবনে তিনি সংবাদপত্রের সঙ্গে থেকে নানা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সর্বোপরি একজন জীবনশিল্পীর চোখে চারপাশ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন।

এই সময় তিনি উপলব্ধি করলেন তাঁর ভাবনাকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার বড় হাতিয়ার হলো সাহিত্যে নিজের অবস্থান তৈরি করা। সেই সময় ধর্মান্ধ জাতিগোষ্ঠীর ভণ্ড ফতোয়া আর ধর্মকে পুঁজি করে নিজেদের আখের গোছানোর প্রক্রিয়াকে তিনি কোনোভাবে মেনে নিতে পারেননি। আর তাই ময়মনসিংহের আঞ্চলিক বুলিকে সাহিত্যের ভাষা করতে চেয়েছেন, যাতে তিনি লোকজ ধারায় পাঠকদের অন্তরে স্থায়ী আবাস গড়তে পারেন। এটা তাঁর আঞ্চলিকপ্রীতির নমুনা হতে পারে কিন্তু আঞ্চলিক বুলিই ভাষাশৈলীর অন্যতম উপাদান, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

তাঁর কর্মজীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি একজন রাজনীতিবিদ, যিনি মন্ত্রী এমনকি ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীও হয়েছেন। প্রাক ১৯৪৭ এবং উত্তর ১৯৭১-এর একজন বস্তুনিষ্ঠ রাজনীতিক ভাষ্যকার, যিনি নিজের আদর্শের জায়গা থেকে

এতটুকু সরেননি। পূর্ব বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণকারী, একজন সংস্কারক। 'সাপ্তাহিক ছোলতান' ও 'মোহাম্মদী'র সহসম্পাদক হিসেবে কাজ করলেও পরবর্তীকালে তিনি 'দি মুসলমান' ও 'খাদেম' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। 'দৈনিক কৃষক' ও 'দৈনিক ইত্তেহাদ' এর সম্পাদক হিসেবে তিনি দীর্ঘকাল কর্মরত ছিলেন।

২.

ইতিহাসে তাঁর নামটি কঠিন সময়ের অকুতোভয় এক যোদ্ধার তালিকায় আছে, যে যোদ্ধা সমাজের অসৎ, দৃষ্টিকটু অসংগতিকে তুলে ধরেছেন ব্যঙ্গাত্মক লেখনীর মধ্য দিয়ে। একজন সফল কথাসাহিত্যিক, যিনি নিজের ভাবনাচিন্তাকে সাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাহিত্য ধারার মধ্য দিয়ে।

সাহিত্যধারায় আমরা আবুল মনসুর আহমদকে উপন্যাস, ছোটগল্প, ব্যঙ্গাত্মক রচনা, প্রবন্ধ ও আত্মজীবনীর মাঝে খুঁজে পাই। সাহিত্যের অন্যান্য আঙিনায়ও স্বচ্ছন্দে পদচারণ করেছেন তিনি। যে অঙ্গনেই তিনি কাজ করেছেন, সেখানেই শীর্ষে অবস্থান করেছেন। ব্যঙ্গ সাহিত্য বলতে গেলে উভয় বঙ্গে তিনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রতিটি স্যাটায়ারই কালোত্তীর্ণ। তাঁর লেখা পাঠ করলে আমাদের মধ্যে বোধের সঞ্চার হয়, সুন্দর প্রবৃত্তি জেগে ওঠে।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'লালসালু' প্রকাশিত হয়। এটি সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ রচিত বিখ্যাত একটি উপন্যাস। এর পটভূমি ১৯৪০ কিংবা ১৯৫০ দশকের বাংলাদেশের গ্রামসমাজ হলেও এর প্রভাব বা বিস্তার কালোত্তীর্ণ। মূলত গ্রামীণ সমাজের সাধারণ মানুষের সরলতাকে কেন্দ্র করে ধর্মকে ব্যবসার উপাদানরূপে ব্যবহারের একটি নগ্ন চিত্র উপন্যাসটির মূল বিষয়। এই উপন্যাসের কথা আমাদের সকলেরই জানা।

'লালসালু' প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগে, অর্থাৎ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে আবুল মনসুর আহমদ 'আয়না' রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গরচনার জগতে আবুল মনসুর আহমদের 'আয়না' একটি কালজয়ী গ্রন্থ। যে গ্রন্থে তিনি মোল্লাতন্ত্র ও লেবাসধারীদের ধর্ম ব্যবসার আড়ালে যে নিচু মন লুকিয়ে আছে, তা উন্মোচন করেছেন। 'আয়না' গ্রন্থে তিনি এমদাদ নামের এমন এক চরিত্রের উন্মেষ ঘটান, যা প্রতি পদে সঠিক বিষয়কে তুলে ধরে। এ যেন এমদাদের মধ্যে আবুল মনসুরের দেখা মেলে।

এমদাদের মাধ্যমে তিনি সমাজের দ্বার উন্মোচন করেছেন। আবুল মনসুর এমদাদের চরিত্রকে এমন এক জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন, যেখানে এমদাদ নিজে নয়, বরং সমাজের মানবিক বোধ তথা প্রগতিশীল ভাবনার মানুষগুলো নিজেদের এইভাবে দেখছে। 'আয়না' গ্রন্থে আবুল মনসুর লিখেছেন–

এমদাদ ভাবল,...'কলিযুগেও দুনিয়ায় ধর্ম আছে।'

বুকের ভেতর হাহাকার নিয়ে এমদাদ অগত্যা 'নামাজে বসিয়া খোদার নিকট হাত তুলিয়া কাঁদিবার বহু চেষ্টা করিল। চোখের পানির অপেক্ষায় আগে হইতে কান্নার মতো মুখ বিকৃত করিয়া রাখিল। কিন্তু পোড়া চোখের পানি কোনো মতেই আসিল না।'

গভীর রাত পর্যন্ত 'এলহু', 'এলহু' জিকির করা জনৈক পীরের স্থানীয় খলিফা সুফি সাহেবের শরণাপন্ন হওয়ার পর তিনি এমদাদের যে গোড়াতেই গলদ, তা ধরে ফেললেন এবং বললেন, 'পীর না ধরিয়া কি কেহ রুহানিয়াত্ হাসিল করিতে পারে?' আরবি ও উর্দুতে হাদিস বয়ান করে মক্কেলের সুবিধার্থে বাংলায় বললেন, 'জয্য়া ও সলুক খতম করিয়া ফানা লাভে সমর্থ হইয়াছেন এরূপ কামেল ও মোকাম্মেল, সালেক ও মজযুব পীরের দামন না ধরিয়া কেহ জমিরের রওশনি ও রুহের তরক্কি হাসেল করিতে পারে না।'

দুই বন্ধু কাজী নজরুল ইসলাম ও আবুল মনসুর আহমদ

সমাজপতি, ধর্মগুরু, রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী–যেখানেই তিনি

দুর্নীতির সন্ধান পেয়েছেন, সেখানেই লেখনীর মাধ্যমে কশাঘাত করেছেন। এমনভাবে তিনি সবার ভেতরের অসৎ চিন্তাকে উন্মোচন করেছেন যে সেই সময় এই কাজটি করার মতো সৎ সাহস কারো ছিল না।

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন আবুল মনসুর আহমদের বন্ধু। বিদ্রোহী কবি তাঁর বন্ধুকে খুব ভালো করে চিনতেন এবং জানতেন। 'আয়না' গ্রন্থের ভূমিকায় কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন, 'এমনি আয়নায় শুধু মানুষের বাইরের প্রতিচ্ছবিই দেখা যায় কিন্তু আমার বন্ধু শিল্পী আবুল মনসুর যে আয়না তৈরি করেছেন, তাতে মানুষের অন্তরের রূপ ধরা পড়েছে। যে-সমস্ত মানুষ হরেক রকমের মুখোশ পরে আমাদের সমাজে অবাধে বিচরণ করছে, আবুল মনসুরের আয়নার ভেতরে তাদের স্বরূপ-মূর্তি বন্য ভীষণতা নিয়ে ফুটে উঠেছে। ব্যঙ্গ-দৃষ্টিতে অসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন। বন্ধু আবুল মনসুরের হাত-সাফাই দেখে বিস্মিত হলুম। ভাষার কান মলে রস সৃষ্টির ক্ষমতা আবুল মনসুরের অসাধারণ।'

আবুল মনসুর আহমদ কোনো ধরনের অসংগতি, অসত্য, প্রহসন পছন্দ করতেন না। তিনি নিজে যা বিশ্বাস করতেন, তাই তাঁর লেখনীতে চরিত্রের মধ্য দিয়ে তুলে ধরতেন। তাঁর মতো সত্যভাষণসম্পন্ন লেখক গোটা দশকে খুঁজে পাওয়া ভার। শুধু ব্যঙ্গাত্মক রচনা বা উপন্যাস নয়, তিনি নিজের আত্মজীবনীতেও কঠিন সত্যকে অকপটে তুলে ধরেছেন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে 'আত্মকথা' প্রকাশিত হয়। এই আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন–

'মুসলমানদের এই সার্বিক অধঃপতনের জন্য দায়ী মোল্লারা। তারাই ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া মুসলমান জনসাধারণকে অজ্ঞান ও দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছে।

'ডা. লুৎফর রহমান, এস ওয়াজেদ আলী, কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী আবদুল ওদুদ, হুমায়ুন কবীর, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ও আমি চুটাইয়া মোল্লা-বিরোধী অভিযান শুরু করিলাম। আমাদের সাথে যোগাযোগ না থাকিলেও ঢাকা হইতে একই সময়ে অধ্যাপক আবুল হোসেন ও কাজী আবদুল ওদুদের নেতৃত্বে "শিখা" সম্প্রদায় একই আন্দোলন শুরু করিলেন।'

'আয়না'র পর ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে 'ফুড কনফারেন্স' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 'ফুড কনফারেন্স' পড়ে বিদগ্ধমহল খুশিতে ফেটে পড়ে। 'ফুড কনফারেন্স' গ্রন্থটি পাঠ করে স্বনামধন্য বাঙালি কবি ও লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় মন্তব্য করেছিলেন,

"'আয়না' লিখিয়া আবুল মনসুর প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছিলেন। 'ফুড কনফারেন্স' লিখিয়া তিনি অমর হইলেন।"

'ফুড কনফারেন্স' নয়টি গল্পের সংকলন। প্রতিটি গল্পই স্বতন্ত্র স্থান-কাল-পাত্র নিয়ে নির্মিত হলেও সামগ্রিকভাবে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের জাতীয় চরিত্রের বাস্তব দিক নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন আবুল মনসুর। রঙ্গ ও ব্যঙ্গের আশ্রয় নিয়ে তিনি বাঙালি চরিত্রের প্রধান দিকগুলো দেখিয়ে পাঠককে প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন বটে; কিন্তু শুধু হাসিই যে মূল উদ্দেশ্য নয়, হাসির পেছনে লেখকের মনের সুপ্ত ভাবনাগুলো পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তা এইখানে প্রকৃষ্ট। আবুল মনসুর প্রতিটা গল্পেই ব্যঙ্গ, রঙ্গ, হিউমারের সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়ে বাংলার জাতীয় জীবনে এই নৈতিক অধঃপতনের বয়ান করেছেন।

'আত্মকথা'র একটি অংশে তিনি বলেছেন, 'ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য ধর্ম। যে ঔষধ রোগীর কাজে লাগিল না তা যেমন বর্জনীয়, যে ধর্ম মানুষের কল্যাণ করিল না তাও বর্জনীয়।'

এই রকম সদাচারী আলাপ করার মতো সাহস একমাত্র আবুল মনসুরের ছিল। তিনি সত্যকে সত্য বলতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করতেন না। 'আয়না', 'ফুড কনফারেন্স', 'সত্যমিথ্যা', 'জীবন ক্ষুধা', 'আবে-হায়াৎ' তাঁর প্রভৃতি রচনা আমাদের মধ্যে চিন্তার উদ্রেক তৈরি করে। বর্তমান সময়ে মৌলবাদের থাবায় আতঙ্কিত মুক্তমনা, মুক্তচিন্তার মানুষ; এই সময় থেকে বহু বছর আগে তিনি এই ধরনের গল্প লিখে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। আজকের দিনে ধর্ম নিয়ে মন্তব্য করা তো দূরে থাক, ধর্ম নিয়ে সঠিক কথাও বলা যায় না। কবি নজরুল ইসলাম তারও বহু আগে তথাকথিত আলেমদের দ্বারা কাফের আখ্যায় চিহ্নিত হয়েছিলেন।

আবুল মনসুর আহমদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'হুযুর কেবলা'। উনিশ শ বিশের দশকে রচিত ও প্রকাশিত গল্পটির আবেদন এখনো সজীব। এই গল্পে ভণ্ড ধর্ম ব্যবসায়ীর স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামজীবনে প্রবলভাবে জেঁকে বসা পীর ব্যবসার বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে এই গল্পে। এক ভণ্ডপীর, পীরের কতিপয় শাগরেদ, তাদের ভণ্ডামি ও মিথ্যাচার এবং এক প্রতিবাদী যুবকের আখ্যান নন্দিত শিল্পরূপে তুলে ধরেছেন আবুল মনসুর।

'হুযুর কেবলা' পড়ে কবি কাজী নজরুল ইসলাম মন্তব্য করেছিলেন, '...হাসির পিছনে যে অশ্রু আছে,...কামড়ের পিছনে যে দরদ আছে, তা যাঁরা ধরতে

পারবেন, আবুল মনসুরের ব্যঙ্গের সত্যিকার রসোপলব্ধি করতে পারবেন তাঁরাই। বন্ধুবরের এ রসাঘাত কশাঘাতেরই মতো তীব্র ও ঝাঁজালো।'

'হুযুর কেবলা' গল্পটি পাকিস্তান আমলে পাঠ্যবইয়ে ছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 'হুযুর কেবলা'কে পাঠ্যবই থেকে বিচিত্র কারণে বাদ দেয়।

আবুল মনসুর আহমদকে বুঝতে হলে তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। তিনি রাজনৈতিক জীবনের মধ্যেই যেন নিজের পরিশুদ্ধতা অর্জন করেছেন এবং তা থেকে পাওয়া জ্ঞান সবাইকে জানিয়েছেন। তিনি একজন প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর লেখনীতে তিনি রাজনীতিবিষয়ক স্যাটায়ারসহ 'রাজনৈতিক বাল্যশিক্ষা' ও 'রাজনৈতিক ব্যাকরণ' রচনায় কুণ্ঠিত হননি।

৩.

আবুল মনসুরের সাহিত্য যেমন পাঠকদের বুদ্ধিদীপ্ত করে তোলে, তাঁর প্রবন্ধ ও আত্মজীবনীও ইতিহাসে অমরতার সাক্ষর রাখে। তাঁর স্মৃতিকথাকে আমরা তিনটি বিভাজনে দেখতে পাই। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'আত্মকথা' এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'শেরেবাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু'তে আমরা ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময়ের বয়ান দেখতে পাই। যদিও কিছু তথ্যের সাথে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করেছেন। তারপরও ওই সময়ের রাজনৈতিক মতাদর্শ, রাজনৈতিক অবস্থান, রাজনীতির গতিপ্রকৃতি পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক সময়ের ধারাভাষ্য দেখতে পাই তাঁর স্মৃতিকথায়।

বর্তমান সময়ে আবুল মনসুর আহমদের সাহিত্য পাঠ খুবই জরুরি। মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি তথা মুক্তচিন্তার খোরাক জোগাতে তাঁর সাহিত্য পাঠের কোনো বিকল্প নেই। তাই নতুন প্রজন্মকে আলোকিত করার লক্ষ্যে অকুতোভয় জীবনশিল্পী আবুল মনসুর আহমদ পাঠ অবশ্য প্রয়োজন।

যদি স্বাধীন বাংলাদেশে 'আয়না', 'ফুড কনফারেন্স' বা 'হুযুর কেবলা' বেশি বেশি পাঠ করা হতো, তবে দেশের মানুষ তথা সকল জনগোষ্ঠী নিজেকে আলোকিত করতে পারত। দেশে জঙ্গিবাদ কমে যেত। দেশের সাধারণ জনগণ ধর্মের প্রকৃত শুদ্ধতায় নিজের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল করতে পারত।

লেখক পরিচিতি : **বিনয় দত্ত**, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

তথ্যসূত্র

১। গল্পগ্রন্থ : আয়না, আবুল মনসুর আহমদ, ড. নুরুল আমিন সম্পাদিত, আহমদ পাবলিশিং হাউজ

২। গল্পগ্রন্থ : ফুড কনফারেন্স, আবুল মনসুর আহমদ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ

৩। গল্পগ্রন্থ : গালিভারের সফরনামা, আবুল মনসুর আহমদ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ

৪। উপন্যাস : আবে হায়াত, আবুল মনসুর আহমদ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ

৫। আত্মজীবনী : আত্মকথা, আবুল মনসুর আহমদ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ

৬। জীবনশিল্পী আবুল মনসুর আহমদ
ইমরান মাহফুজ সম্পাদিত, আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি পরিষদ

৭। আবুল মনসুর আহমদ স্মারকগ্রন্থ, ইমরান মাহফুজ সম্পাদিত, প্রথমা প্রকাশন

৮। যেখানে আবুল মনসুর আহমদ স্বতন্ত্র, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
http://www.bd-pratidin.com/rokomari-sahitto/2016/03/25/134712

৯। আবুল মনসুর আহমদ, আন্দালিব রাশদী । আগস্ট ২৪, ২০১৬
http://bonikbarta.net/bangla/magazine-post/95/%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%A6—/

১০। আবুল মনসুর আহমদ দুর্লভ আলো, ইমরান মাহফুজ। এপ্রিল ০৬, ২০১৮
http://bonikbarta.net/bangla/magazine-post/1668/%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%A6-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%AD-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8B/

১১। আবুল মনসুর আহমদ : একজন বিরলপ্রজ মানুষ, ইমরান মাহফুজ, মার্চ ১৮, ২০১৭
http://www.poriborton.com/article/40838

১২। আবুল মনসুর আহমদ : অনালোকে আলোকিত জন, সৌম্য সালেক
https://www.kaliokalam.com/%e0%a6%86%e0%a6%ac%e0%a7%81%e0%a6%b2-%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a6%b8%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a6%ae%e0%a6%a6-%e0%a6%85%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%86/

১৩। সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
http://www.jaijaidinbd.com/?view=details&type=single&pub_no=1512&ca

t_id=3&menu_id=75&news_type_id=1&news_id=231582&archiev=yes&arch_date=08-04-2016

১৪। প্রজ্ঞার সাহস, কাজল রশীদ শাহীন
https://www.kaliokalam.com/%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%9c%e0%a7%8d%e0%a6%9e%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%b8/

১৫। আবুল মনসুর আহমদ চিরস্মরণীয়, গালিব আসাদ উল্লাহ, শুক্রবার, ১৮ মার্চ ২০১৬
http://www.bhorerkagoj.com/print-edition/2016/03/18/80517.php

১৬। আবুল মনসুর আহমদের লেখা বাঙালিদের দিকনির্দেশনা দেয়, অমর সাহা, কলকাতা
২১ এপ্রিল ২০১৮

http://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1474486/%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F

১৭। আবুল মনসুর আহমদ : বিরল ব্যতিক্রম, কাজল রশীদ শাহীন। প্রকাশ : ১৭ মার্চ ২০১৭
https://www.jugantor.com/news-archive/literature-magazine/2017/03/17/109731/%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%A6-:-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE

স্থানীয় সংবাদপত্র : সংকটের দোলাচল
পরিপ্রেক্ষিত ঝালকাঠি

আমীন আল রশীদ

'স্থানীয় সংবাদপত্রের কথা ভাবতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে চার পৃষ্ঠার এক বিবর্ণ পত্রিকার অবয়ব। দুর্বল পৃষ্ঠাসজ্জা আর অগুরুত্বপূর্ণ ইস্যু দিয়ে ভরা মলিন এক কাগজের প্রতিমূর্তি।' (অধিকারী, ২০১২: ৬৫)

গ্রাম ক্রমশ শহর হয়ে উঠছে। যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, নাগরিক সেবা যেমন বিদ্যুৎ ও পানির লাইন, স্যাটেলাইট চ্যানেল ইত্যাদি পৌঁছে গেছে তৃণমূলেও। কিন্তু তারপরও প্রতিটি অঞ্চলের রয়েছে নিজস্বতা। আর এই পৃথক বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রতিটি এলাকার জনগণের জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা-সম্ভাবনার মধ্যেও রয়েছে ভিন্নতা। প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা-সম্ভাবনার কথা জনসমক্ষে প্রকাশের প্রয়োজনেই সুদূর অতীত থেকে রাজধানীর বাইরের বিভিন্ন বিভাগীয় শহর, জেলা বা উপজেলা শহর থেকে যে সংবাদপত্রগুলো প্রকাশিত হয়ে থাকে, তা-ই আঞ্চলিক সংবাদপত্র বা স্থানীয় সংবাদপত্র। আর এসব সংবাদপত্র নির্দিষ্ট একটি এলাকার জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-চেতনা, সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রকাশ করে (অনেক সময়ই করে না)। এদের বিস্তৃতি দেশে একটি ক্ষুদ্রতর পরিসরে সীমিত থাকলেও সামগ্রিকভাবে দেশের মানবাধিকার, সুশাসন ও গণতন্ত্রের বিকাশে এসব গণমাধ্যমের যথেষ্ট ভূমিকা পালন করার কথা।

বাস্তবতা হলো, যোগাযোগব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নের ফলে এখন প্রতিদিন সকালেই রাজধানী ঢাকা থেকে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিকগুলো হাতে পায় মফস্বলের পাঠকেরা। আবার ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের সহজলভ্যতায় যখন মানুষ মোবাইল ফোনেই তাৎক্ষণিক খবর পায়, তখন স্থানীয় সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তাই-বা কতটুকু ধরে রাখতে পারছে, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে জাতীয় দৈনিকগুলো স্থানীয় সমস্যার চেয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। আর যে কারণে স্থানীয় পর্যায়ের একটি অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ সংবাদও হয়তো ঢালিউডের একজন নায়িকার শরীর খারাপ হয়ে যাওয়ার সংবাদের নিচে চাপা পড়ে যায়। বাজারে আসা নতুন কোনো বিলাস সামগ্রীর বিজ্ঞাপনের ধাক্কায় ঝালকাঠির এক এসএসসি পরীক্ষার্থীর টাকার অভাবে পরীক্ষা দিতে না পারার সংবাদটি হয়তো গুরুত্বই পায় না। সুতরাং পাঠককে তার নিজের এলাকার, নিজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সংবাদ জানতে শেষমেশ চার পৃষ্ঠার ওই সাদাকালো স্থানীয় পত্রিকার ওপরই নির্ভর করতে হয়। কিন্তু পাঠকের সেই চাহিদা স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো কতটুকু পূরণ করতে পারছে–সেই প্রশ্নও আছে।

এই নিবন্ধে স্থানীয় সংবাদপত্রের বিকাশ ও বিকাশের অন্তরায়, চ্যালেঞ্জ, মূলধারার গণমাধ্যমের সাথে এর পার্থক্য এবং ইন্টারনেটের অভাবনীয় বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে এর চাহিদার বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। এই গবেষণায় বরিশাল বিভাগের ঝালকাঠি জেলা শহর থেকে প্রকাশিত নিয়মিত-অনিয়মিত দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোকে কেসস্টাডি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয় ২০০৩-০৪ সালে। কিন্তু এক যুগের বেশি সময় পরও সেই বাস্তবতার কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। বরং স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রকাশিত মুদ্রিত সংবাদপত্রের পাঠকপ্রিয়তা বা চাহিদা আরও কমেছে বলেই ধারণা করা যায়। এর সাথে সাথে অবশ্য ইন্টারনেট ও স্মার্টফোন সহজলভ্য হওয়ায় স্থানীয় পর্যায় থেকে বিভিন্ন অনলাইন পোর্টাল চালু হয়েছে। এসব অনলাইন পোর্টালের বিষয়বস্তু, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, পাঠকপ্রিয়তা, আর্থিক কাঠামো ইত্যাদি নিয়ে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই গবেষণা হবে। এ ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে, নীতিমালার আওতায় না আসায় এখনো এসব অনলাইন সংবাদপত্র ওই অর্থে পেশাদার হয়ে ওঠেনি এবং খবরের চেয়ে বিভ্রান্তি, গুজব ও নানা রকম ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিই এসব কথিত সংবাদপত্রের মূল কাজ বলে মানুষ বিশ্বাস করে।

লার্ন এশিয়া, রিসার্চ আইসিটি আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সংস্থা ডিআইআরএস আইয়ের এক সমীক্ষায় বাংলাদেশের ৬৬ শতাংশ মানুষ বলেছেন, তাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের খবরে বিশ্বাস করেন না। এর মধ্যে মোটেও বিশ্বাস না করার হার ৫৩ শতাংশ। বিশ্বাস না করার হার ১৩ শতাংশ। বাকি ৩৪ শতাংশের ২৬ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন। ৮ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা এ বিষয়ে জানেন না *(প্রথম আলো, ৩ অক্টোবর ২০১৮)*। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

নিয়ে ১৮টি দেশের ১৫ থেকে ৬৫ বছর বয়সী মানুষের ওপর 'আফটার অ্যাকসেস: আইসিটি অ্যাকসেস অ্যান্ড ইউজ ইন এশিয়া অ্যান্ড দ্য গ্লোবাল সাউথ' শীর্ষক এই সমীক্ষাটি পরিচালনা করা হয়। ২ অক্টোবর লার্ন এশিয়ার পক্ষ থেকে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে সমীক্ষার ফলাফল তুলে ধরা হয়।

গবেষণা এলাকা

আয়তনের দিক দিয়ে দেশের ক্ষুদ্রতম জেলা মেহেরপুরের পরই ঝালকাঠির অবস্থান। অর্থাৎ ঝালকাঠি হচ্ছে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম জেলা। এর ১৭ কিলোমিটার

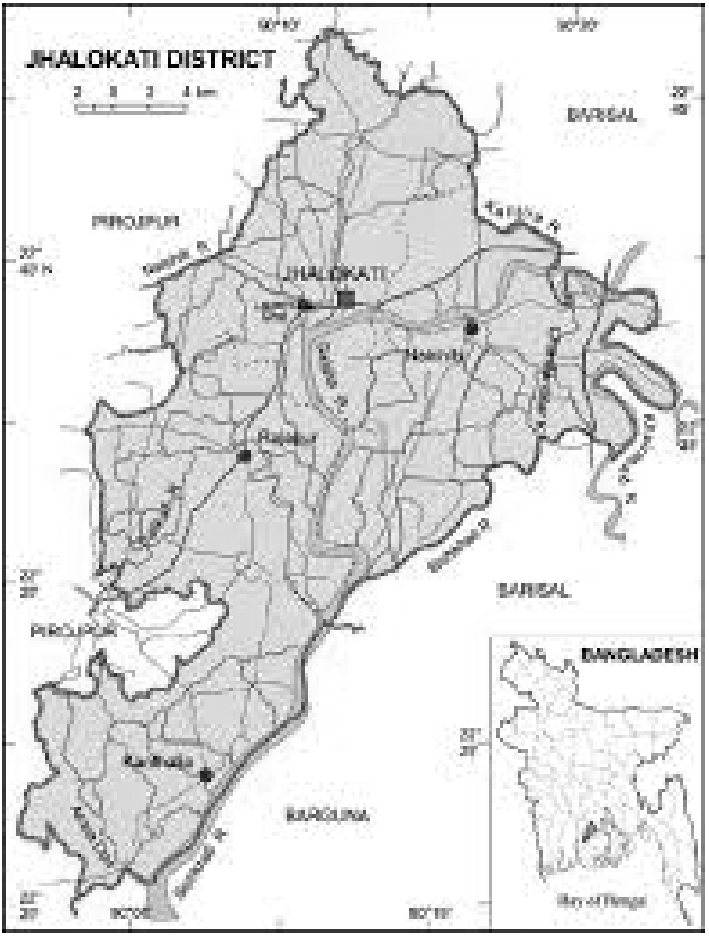

পূর্বে বিভাগীয় শহর বরিশাল, পশ্চিমে পিরোজপুর জেলা, দক্ষিণে বিষখালী নদী ও বরগুনা জেলা এবং উত্তরে বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলা। নলছিটি, রাজাপুর, কাঁঠালিয়া ও সদরসহ মোট ৪টি উপজেলা, ২টি পৌরসভা এবং ৩২টি ইউনিয়ন মিলিয়ে ঝালকাঠির আয়তন ৭৩৫.০৯ বর্গকিলোমিটার। ঝালকাঠি জেলায় মোট গ্রামের সংখ্যা ৪৭১টি। লোকসংখ্যা প্রায় ৭ লাখ। ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে সাক্ষরতার হার শতকরা ৫৫ ভাগ (জেলা তথ্য বাতায়ন)। ঝালকাঠিকে একসময় বলা হতো দ্বিতীয় কলকাতা। কারণ, দক্ষিণাঞ্চলের বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার ছিল এই ঝালকাঠি। পাশাপাশি ঝালকাঠির লবণ, গামছা, শীতলপাটি ইত্যাদি ছিল দেশখ্যাত। এসব ঐতিহ্য এখনো কোনোমতে টিকে আছে।

ফিরে দেখা

ঝালকাঠি প্রেসক্লাবের সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকায় 'ঝালকাঠি প্রেসক্লাবের ৫০ বছর' শীর্ষক নিবন্ধে সাংবাদিক হেমায়েত উদ্দিন হিমু লিখেছেন, 'ঝালকাঠির বাসণ্ডা গ্রামে শ্রী পূর্ণচন্দ্র সেন ১৮৬৬ সালে 'পূর্ণচন্দ্রোদয়' নামে একটি ছাপাখানা বসান। এটি দক্ষিণ বাংলার প্রথম মুদ্রণযন্ত্র। আর এখান থেকেই তিনি প্রকাশ করেন এই অঞ্চলের প্রথম পত্রিকা 'পরিমল বাহিনী'। এতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো না। এ পত্রিকাটি ব্রিটিশিবিরোধী আন্দোলনের সপক্ষে সাহসী ভূমিকা পালন করত। ১৮৭৩-এর পূর্ব পর্যন্ত বরিশালের সমস্ত পত্রিকাই ঝালকাঠির বাসণ্ডায় স্থাপিত ওই ছাপাখানায় প্রকাশিত হতো। ১৮৭১ সালে তারপাশার আরেক পণ্ডিত নবীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রকাশ করেন 'হিতসাধিনী' নামের একটি পত্রিকা। ১৯০০ সালে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রচেষ্টায় ঝালকাঠির কাঁচাবালিয়া গ্রামের প্রিয়নাথ গুহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'বিকিরণ'। এই পত্রিকাগুলো শুধু ঝালকাঠিই নয়, পুরো দক্ষিণাঞ্চলের সংবাদপত্রের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। (হিমু, ২০১৭: ৩০)।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে স্বরাজ পাল সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'রবিবারের চিঠি'কেই ঝালকাঠির প্রথম সংবাদপত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এরপরে ১৯৯০ সালে মনিরুজ্জামানের সম্পাদনায় বের হয় সাপ্তাহিক 'বিপ্লবী বাংলা'। পরে নানা কারণে এটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯২ সালে হেমায়েত উদ্দিন হিমুর সম্পাদনায় বের হয় সাপ্তাহিক 'সূর্যালোক'। এ পত্রিকাটিও দুই বছর টানা এবং পরবর্তী বছর তিনেক অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পরে সেটি পরবর্তীতে আবার প্রকাশিত হয়। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার প্রসঙ্গে হেমায়েত উদ্দিন হিমুর ভাষ্য, স্থানীয় পর্যায়ে একটি পত্রিকা টিকিয়ে রাখতে যে পরিমাণ সরকারি তোষণ আর

রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি করতে হয়, তা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া সাপ্তাহিক পত্রিকায় সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়া যেত না এবং ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন পেলেও তার টাকা আদায় করতে বেশ বেগ পেতে হতো। পাশাপাশি ঝালকাঠিতে তখন অফসেট প্রেস না থাকলেও লেটার প্রেস ছিল। অথচ প্রেসের মালিকেরা পত্রিকা ছাপতে খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। ফলে পত্রিকা ছাপিয়ে আনতে হতো বরিশাল থেকে। আর যে সাধারণ পাঠকের স্বার্থ ও সুবিধার কথা ভেবে পত্রিকাটি প্রকাশ করা হয়েছিল, সেই পাঠকমহলই শেষ পর্যন্ত পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এগিয়ে আসেনি। আবদুর রহমান কাজলের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'অজানা খবর' নামে একটি পত্রিকা বের হয়। এর প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫ সাল। মাঝেমধ্যে এটি একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

ঝালকাঠি জেলার প্রথম দৈনিক পত্রিকা 'শতকণ্ঠ'। জাহাঙ্গীর হোসেন মনজুর সম্পাদনায় ১৯৯৮ সালে ঝালকাঠি থেকে এটি প্রথম প্রকাশিত হলেও পত্রিকাটির জন্ম মূলত ১৯৯৪ সনে। ঝালকাঠির আগে এটি নিয়মিতভাবে খুলনা থেকে প্রকাশিত হতো। কিন্তু বিভাগীয় শহর বরিশাল থেকে ভালো ছাপায় প্রকাশিত কয়েকটি দৈনিকের সামনে পত্রিকাটি তার বাজার তৈরি করতে পারেনি।

এরপর মাহবুব আলমের সম্পাদনায় ২০০০ সালে যাত্রা শুরু করে দৈনিক 'ঝালকাঠি বার্তা'। ২০০২ সালের অক্টোবরে আবদুর রহমান কাজলের সম্পাদনায় 'অজানা বার্তা' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। বিজ্ঞাপনের অভাবে এ পত্রিকাটিও প্রায়শই বন্ধ হয়ে যায়।

পত্রিকা বিশ্লেষণ

স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো সাধারণত স্থানীয় রাজনীতি, রাজনৈতিক নেতাদের কর্মকাণ্ড বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট আসনের সংসদ সদস্য, মন্ত্রী, অন্য জনপ্রতিনিধিদের কর্মকাণ্ড, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের অনুষ্ঠান, সভা-সেমিনার, সংঘাত-সংঘর্ষ, নির্যাতন, বিশেষ করে নারী নির্যাতন (এ বিষয়ে অনেক খবরই পক্ষপাতদুষ্ট), জমিজমা নিয়ে বিরোধ (এ-বিষয়ক খবরের পেছনে অনেক সময় কোনো একটি বা একাধিক পক্ষের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ প্রভাবিত হয়ে থাকে) ইত্যাদি সংবাদকেই গুরুত্ব দেয়। কোনো কোনো সংবাদপত্রের দুই তৃতীয়াংশজুড়েই থাকে জাতীয় সংবাদ। বিশেষ করে যেসব স্থানীয় সংবাদপত্র ঢাকার ফকিরাপুলের কোনো প্রেস থেকে ছাপা হয়। ওই এলাকা থেকে প্রচুর সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়

(যেগুলোকে অনেক সময় আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা বলে অভিহিত করা হয়) এবং একই সংবাদ ও নিবন্ধ একসঙ্গে অনেকগুলো পত্রিকায় ছাপা হয়। এখানে সংবাদ বেচাকেনা হয়। কখনো-সখনো পুরো পৃষ্ঠাই বিক্রি হয়। সংশ্লিষ্ট পত্রিকা শুধু তার নাম ও প্রিন্টার্স লাইন অপরিবর্তিত রেখে হুবহু সেই কিনে নেওয়া সংবাদ ছাপিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে বিক্রি ও বিলি করে। এসব পত্রিকার একটি বড় অংশই অতি সামান্য সংখ্যায় ছাপানো হয় শুধু সংবাদসংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কাছে পৌঁছানোর জন্য।

স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোয় সাধারণত ভাসা ভাসা রিপোর্ট ছাপা হয়। ডেজ ইভেন্ট বা দিনের ঘটনার বাইরে খুব বেশি ফলোআপ বা অনুসন্ধানী রিপোর্ট সেভাবে চোখে পড়ে না। কোনো বিষয়ে মানসম্মত ও বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধানী রিপোর্ট করার মতো দক্ষ সাংবাদিকও তৈরি হয়নি। ফলে এসব সংবাদপত্র সাধারণ পাঠকের সংবাদক্ষুধা মেটাতে পারে সামান্যই। (জাহাঙ্গীর, ১৯৮৭: ৬১)

ঝালকাঠি থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'শতকণ্ঠে'র এক সপ্তাহের কপি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সেখানে সাত দিনে প্রকাশিত ৮৭টি সংবাদের মধ্যে ৬৭টিই ঝালকাঠি জেলার সংবাদ। বাকি ২০টি পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের। এ প্রসঙ্গে পত্রিকার সম্পাদক বলেন, 'আমি এই পত্রিকাটি আগে খুলনা থেকে বের করতাম। সেখানে খেয়ে-পরে ভালোই ছিলাম। কিন্তু ঝালকাঠির কয়েকজন সাংবাদিক আমাকে বললেন, আপনি যেহেতু ঝালকাঠির সন্তান, সুতরাং পত্রিকাটি ঝালকাঠিতে নিয়ে আসেন। আমি তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে পত্রিকাটি ঝালকাঠিতে নিয়ে আসি। অবশ্য নিজের জেলার প্রতি একটা দায়বদ্ধতা তো ছিলই। আর শুরু থেকেই আমার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো ঝালকাঠি একটা জেলা শহর, এখানে ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম শ্রেণির সব পত্রিকাই আসে, পাশাপাশি বরিশাল থেকে প্রকাশিত আঞ্চলিক দৈনিকগুলোও। সুতরাং আমি আমার পত্রিকায় কেবল ঝালকাঠি জেলার সংবাদকেই গুরুত্ব দেব। পারতপক্ষে অন্য জেলার সংবাদ ছাপব না। এ লক্ষ্য-আদর্শে আমি এখনো অটল। আমার বিশ্বাস, আমি আমার পত্রিকায় আমার জেলাকে বেশ ভালোভাবেই উপস্থাপন করতে পারছি।'

ঝালকাঠি থেকে প্রকাশিত আরেকটি দৈনিক 'ঝালকাঠি বার্তা'র এক সপ্তাহের কপি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে একটু ভিন্ন চিত্র। এ পত্রিকাটিতে এক সপ্তাহে প্রকাশিত ৪৬টি সংবাদের মধ্যে ২৬টি ঝালকাঠি জেলার ও বাকি ২০টি ছিল জেলার বাইরের। নিজের জেলার সংবাদের হার তুলনামূলক কম কেন জানতে চাইলে পত্রিকার বার্তা সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দত্ত জানান, লোকবলের অভাব। আবার

বেতন দিয়ে সাংবাদিক বা রিপোর্টার রাখাও পত্রিকার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, সেখানে অর্থের একটা ব্যাপার রয়েছে। তিনি বলেন, পত্রিকাটি যে জেলা থেকে বের হচ্ছে, সেখানের সংবাদই বেশি থাকবে, এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু সে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পারা যাচ্ছে না।

ওই দুটি পত্রিকায়ই দেখা গেছে সংবাদের চেয়ে বিজ্ঞাপনের আধিক্য। যেমন ৪ পৃষ্ঠার পত্রিকা 'ঝালকাঠি বার্তা'র প্রথম পৃষ্ঠায় কেবল সংবাদ এবং শেষ পৃষ্ঠায় ওই সকল সংবাদের বাকি অংশ। বাকি দুই ও তিন নম্বর পৃষ্ঠা পুরোপুরিই বিজ্ঞাপনে ঢাকা। এমনকি সম্পাদকীয়ও নেই। যদিও এসব বিজ্ঞাপন প্রতিদিনই ছাপা হয়। কিন্তু পয়সা নেই। একইভাবে 'শতকণ্ঠে'রও প্রথম পৃষ্ঠায় শুধু সংবাদ এবং শেষ পৃষ্ঠায় সংবাদের বাকি অংশ। অবশিষ্ট দুই নম্বর পৃষ্ঠার একটি অংশজুড়ে উপসম্পাদকীয় থাকলেও কোনো সম্পাদকীয় নেই। দুই ও তিন নম্বর পৃষ্ঠার বাকি অংশ 'ঝালকাঠি বার্তা'র মতোই বিজ্ঞাপনের দখলে। দুটি পত্রিকায়ই প্রতিদিন একই বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। কদাচিৎ অন্য বিজ্ঞাপন এবং দুজন সম্পাদকই এই বিজ্ঞাপনের আধিক্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জানিয়েছেন সংবাদ-সংকটের কথা। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত জাতীয় দৈনিকগুলো যেখানে বিজ্ঞাপনের চাপের কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদও ছাপতে পারে না, সেখানে ঝালকাঠির পত্রিকাগুলো সংবাদ-সংকটের কারণে অনেক বিজ্ঞাপন খুবই সামান্য পয়সায় কিংবা কখনো বিনে পয়সায়ও ছাপে। সংবাদ কমের পেছনে লোকবল-সংকটও একটি বড় কারণ।

এই গবেষণায় তুলনামূলক আলোচনার জন্য ঝালকাঠির পাশাপাশি বিভাগীয় শহর বরিশালের তিনটি পত্রিকাও বিশ্লেষণ করা হয়। এগুলো হচ্ছে 'আজকের পরিবর্তন', 'আজকের বার্তা' ও 'দক্ষিণাঞ্চল'। এর সাথে ঝালকাঠির দুটি দৈনিক পত্রিকা 'শতকণ্ঠ' ও 'ঝালকাঠি বার্তা'য় প্রকাশিত সাত দিনের সংবাদ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, সুশাসন ও জেন্ডার ইস্যুতে এসব পত্রিকার সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা এবং বিশেষ অ্যাজেন্ডা না থাকলেও এ-সম্পর্কিত কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

অন্যান্য সংবাদের সাথে, বিশেষ করে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের মতো বিষয়গুলো বিশ্লেষণের কারণ, একটি রাষ্ট্র ও সমাজে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সুশাসনের চর্চা কতটুকু আছে, তার ওপর নির্ভর করে সেই সমাজ ও রাষ্ট্র কতটা অগ্রসর। এ কারণে এই গবেষণায় স্থানীয় সংবাদপত্রে এই ইস্যুগুলো কতটা গুরুত্ব পায়, তা দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

সাত দিনে এ পাঁচটি পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট চারটি বিষয়ে সংবাদের চিত্র

পত্রিকা	মোট সংবাদ	মানবাধিকার	গণতন্ত্র	সুশাসন	জেন্ডার
আজকের পরিবর্তন	৪৪৯	২৯	৫	১৬	৩
আজকের বার্তা	৪৩৪	২৩	৯	১৯	১
দক্ষিণাঞ্চল	৪০৮	৮	৬	২৯	২
শতকণ্ঠ	৭১	৫	০	১৫	০
ঝালকাঠি বার্তা	৬৭	৫	২	৬	০
মোট	১৪২৯	৭০	২২	৮৫	৬

বিকাশ ও বিকাশের অন্তরায়

'সাংবাদিক পরিচয়ে নিজেকে সমাজের একজন বিশেষ কেউ হিসেবে তুলে ধরতে গিয়ে অনেকে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং মনোযোগের অভাবে সাংবাদিকতাকে পার্শ্ববৃত্তি হিসেবে গ্রহণের প্রবণতাও রয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় একজন করেন সাংবাদিকতা কিন্তু সংসার চালান ভিন্ন কাজ করে।'
(উর্মি ও গুপ্ত, ২০০২: ১৪)

খুব সাদামাটাভাবে একটি সংবাদপত্রের বিকাশ বলতে বোঝায় তার কাঙ্ক্ষিত প্রচার ও পাঠকপ্রিয়তা। জাতীয় দৈনিকগুলো যেমন তাদের পত্রিকাটি 'প্রচার সংখ্যায় শীর্ষে' বলে ঘোষণা দেয়, স্থানীয় পত্রিকার বেলায় তা হয়ে ওঠে না। স্থানীয় পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতেও কর্তৃপক্ষকে রীতিমতো যুদ্ধে নামতে হয়।

দৈনিক 'অজানা বার্তা'র সম্পাদক আবদুর রহমান কাজল মনে করেন, ঝালকাঠি থেকে কোনো পত্রিকা বিকশিত না হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় বাধা অর্থনৈতিক সংকট। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে বিজ্ঞাপন-সংকট। পাশাপাশি ঝালকাঠিতে স্থানীয় পত্রিকার পাঠকেরও যথেষ্ট অভাব। তাঁর মতে, এখানকার মানুষ স্থানীয় পত্রিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে 'ঝালকাঠি বার্তা'র বার্তা সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দত্ত বলেন, একটা মহৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে তারা গণমাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী ঝালকাঠি জেলাকে তুলে ধরার জন্য 'ঝালকাঠি বার্তা' নাম দিয়ে পত্রিকাটি বের করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিনেও পত্রিকাটিকে একটি সফল সংবাদপত্র হিসেবে বিকশিত করা সম্ভব হয়নি। এর প্রথম কারণ পত্রিকাটির আহামরি প্রচার নেই। এটিকে সর্বস্তরের পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং প্রিয় করে তোলার জন্য গুণগত মানের ক্ষেত্রে যে বিকাশ প্রয়োজন, তা করা যায়নি। আর এই বিকাশের জন্য যে অর্থনৈতিক সহায়তা দরকার, তা-ও পাওয়া যায়নি।

সম্পাদক ও বার্তা সম্পাদকদের সঙ্গে আলোচনার পর ঝালকাঠি থেকে কোনো সংবাদপত্র বিকশিত হতে না পারার পেছনে সুনির্দিষ্টভাবে যেসব কারণ উঠে এসেছে, তা হলো:

১. অর্থনৈতিক নিশ্চয়তার অভাব

অর্থনৈতিক নিশ্চয়তার অভাব বলতে বোঝায় আগামীকাল যে পত্রিকাটি বের হবে, তার ছাপার খরচ, তার কাগজের খরচ, পত্রিকার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের খরচ উঠবে কি না, তার নিশ্চয়তা। স্থানীয় পাঠকদের অনেকে নিতান্ত দায়ে পড়ে তথা একরকম চক্ষুলজ্জায় একটি স্থানীয় পত্রিকা কিনলেও মাস শেষে পত্রিকার দাম বাবদ যে ৬০ টাকা বা ৯০ টাকা বিল আসে, সেটিও নিয়মিত পরিশোধ করেন না অনেকেই। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে যে বিজ্ঞাপনগুলো আসে, পত্রিকায় ছাপা হবার পর ওই বিজ্ঞাপনের বিল ওঠাতে আঞ্চলিক ভাষায় 'পাম বেরিয়ে যায়'। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সম্পাদক বলেন, 'অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয় যে, পাঁচ হাজার টাকার বিল ওঠাতে গিয়ে অফিসে যাতায়াত, তদবির সবকিছু মিলিয়ে তার পেছনে তিন হাজার টাকাই খরচ হয়ে যায়। তাহলে বাকি থাকল কী? স্থানীয় সংবাদপত্রের অনেক সাংবাদিকই দুর্নীতিগ্রস্ত–এ রকম অভিযোগ শোনা যায়। বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ স্থানীয় পত্রিকাই তাদের কর্মীদের নিয়মিত এবং সম্মানজনক বেতন-ভাতা দিতে পারে না। ফলে সংবাদকর্মীরা অনেক সময় প্রভাবশালী বা পয়সাওয়ালাদের কাছে অনেক কম টাকায়ও বিক্রি হয়ে যান। (অধিকারী, ২০১২: ৬৭)

২. বিজ্ঞাপন-সংকট

বিজ্ঞাপন বণ্টন নীতি, স্থানীয় বিজ্ঞাপন ও সরকারের তথ্য বিভাগের মাধ্যমে ঢাকা থেকে নিয়ন্ত্রণ, সরকারি বিজ্ঞাপনের বিল আদায়ে অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলা (ঘুষ ছাড়া বিল আদায় কঠিন), স্থানীয় বিজ্ঞাপন স্থানীয় সরকারি প্রশাসন, বিত্তবান রাজনীতিক পেশিশক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকায় স্থানীয় পত্রিকাগুলোকে প্রতিনিয়তই নানা রকম অনিয়মের সঙ্গে আপস করতে হয়। ফলে সংবাদপত্রে মান উন্নয়নে তাদের নজর দেওয়া কঠিন।

অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ বিজ্ঞাপন-সংকট। আবার সরকারি বিজ্ঞাপন সরবরাহ করে ডিএফপি (ডিপার্টমেন্ট অব ফিল্ম অ্যান্ড পাবলিকেশন) নামে যে প্রতিষ্ঠান, সেখান থেকে বিজ্ঞাপন আনতে গিয়ে যথেষ্ট তদবির করতে হয় বলে স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদকদের অভিযোগ। দৈনিক

'শতকণ্ঠে'র সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন মনজু বলেন, 'বিজ্ঞাপন না পেলে আমাদের দেশের স্থানীয় পত্রিকাগুলোর টিকে থাকা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এ রকম অনেক স্থানীয় পত্রিকা আছে, যেগুলো কোনো বিজ্ঞাপন ছাড়াই বের হয়। কেবল পত্রিকা বিক্রির টাকা দিয়েই ওই সকল পত্রিকা চলে। কিন্তু আমাদের দেশে এ রকম সংস্কৃতি এবং জনসচেতনতা এখনো তৈরি হয়নি।

৩. রাজনৈতিক চাপ

একজন সম্পাদক মন্তব্য করেছেন, ছোট জায়গায় বড় সমস্যা। জাতীয় দৈনিকগুলোর ভিত্তি এত শক্ত যে, তারা যেকোনো রাজনৈতিক শক্তিকে অনায়াসে মোকাবিলা করতে পারে। কিন্তু একটি স্থানীয় পত্রিকাকে সব সময়ই তার শহরের রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের মন জুগিয়ে চলতে হয়। বিশেষত ক্ষমতাসীনদের খেপিয়ে ঝালকাঠির মতো একটি ছোট শহরের সংবাদপত্র টিকিয়ে রাখা খুবই দুরূহ। অর্থাৎ স্থানীয় পত্রিকাগুলোকে রাজনৈতিক বিষয়গুলো যতটা সম্ভব চেপে যেতে হয়, এতে তাদের পাঠকপ্রিয়তা কমে। ফলে এই দ্বিমুখী সমস্যা স্থানীয় পত্রিকাগুলোর বিকাশের পথে দারুণ বাধার সৃষ্টি করে।

বাস্তবতা হলো, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও ক্ষমতাবানদের সুনজরে থাকতে গেলে পত্রিকার পাঠকপ্রিয়তা থাকে না। এতে একদিকে স্থানীয় পত্রিকার ওপর মানুষের ভরসা তৈরি হয় না। আবার প্রভাবশালীদের সুনজরে না থাকলে বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় না। এটি স্থানীয় সংবাদপত্রের জন্য একটি বড় ধরনের শাঁখের করাত।

৪. ঝালকাঠি ও বরিশালের মধ্যে কম দূরত্ব

ঝালকাঠির সঙ্গে বিভাগীয় শহর বরিশালের দূরত্ব মাত্র ১৭ কিলোমিটার। প্রতিদিন খুব সকালেই বরিশাল শহর থেকে দৈনিক 'আজকের পরিবর্তন', 'আজকের বার্তা', 'দক্ষিণাঞ্চল'–ইত্যাদি পত্রিকা ঝালকাঠিতে চলে আসে। ফলে ওই পত্রিকাগুলোর সামনে দিয়ে ঝালকাঠির দৈনিক 'শতকণ্ঠ' কিংবা 'ঝালকাঠি বার্তা' অথবা 'অজানা বার্তা' কিনতে মানুষ খুব একটা আগ্রহী হয় না।

৫. বিষয়বস্তুর মান

পাঠকদের আকৃষ্ট করতে পত্রিকায় যেসব আকর্ষণীয় বিষয় থাকা প্রয়োজন, অর্থাৎ পাঠক যা চায়, তা দিতে না পারাও স্থানীয় পত্রিকা বিকাশের পথে অন্যতম

বাধা। একটি জাতীয় দৈনিকের সঙ্গে বরিশাল বা ঝালকাঠি থেকে প্রকাশিত দৈনিকের তুলনা করলেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আবার বরিশাল থেকে প্রকাশিত 'আজকের পরিবর্তন', 'আজকের বার্তা' বা অন্য পত্রিকার সঙ্গে ঝালকাঠির 'শতকণ্ঠ' বা 'ঝালকাঠি বার্তা'র তুলনামূলক বিচার করলেও একই চিত্র পাওয়া যাবে।

৬. এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা নির্ধারণে ব্যর্থতা

পাঠক কেন একটি জাতীয় দৈনিকের পাশাপাশি তার নিজের জেলা বা উপজেলা শহর থেকে প্রকাশিত পত্রিকা কিনবে যদি ওই পত্রিকা তার নিজের এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা নির্ধারণে ব্যর্থ হয়? ঢাকা থেকে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিকগুলোয় স্থানসংকুলানের অভাবে সব জেলার সব সংবাদ ছাপতে পারে না। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় পত্রিকাগুলোই স্ব স্ব এলাকার জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি বেশ ফলাও করে ছাপতে পারে। আর এই দায়িত্ব পালনে যদি কোনো পত্রিকা ব্যর্থ হয়, তাহলে মানুষ সেই পত্রিকা কেন নেবে? ঝালকাঠি থেকে প্রকাশিত দৈনিকগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, একমাত্র দৈনিক 'শতকণ্ঠ'ই জেলার সমস্যা কিছুটা গুরুত্বের সঙ্গে ছাপে। কিন্তু বাকি পত্রিকাগুলোয় স্থানীয় সমস্যার খুব একটা প্রতিফলন নেই। এর একটা বড় কারণ, একটি চার পৃষ্ঠার পত্রিকার জন্য যে পরিমাণ কনটেন্ট বা সংবাদ বিশ্লেষণ দরকার, তা সংগ্রহ লেখার মতো জনবল নিয়োগের ক্ষমতা অধিকাংশ স্থানীয় পত্রিকার থাকে না।

৭. পাঠকদের জানার আগ্রহের সীমাবদ্ধতা ও পত্রিকার গুণগত মান

ঝালকাঠির কয়েকজন পত্রিকার পাঠক (কামরুল ইসলাম মিলন, মাহমুদ রিয়াদ, সাইদুল ইসলাম, মেহেদী হাসান প্রমুখ) মন্তব্য করেছেন, ঝালকাঠির মতো একটা মফস্বল শহরের মানুষের জানার আগ্রহ আসলে কতটুকু? এখানে বড় কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই, নেই বৃহৎ কোনো শিল্পকারখানাও। ফলে এ শহরের পত্রিকার পাঠকদের অধিকাংশই সাধারণ ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী ও ছাত্রছাত্রী। তারা প্রতিদিনকার যে সংবাদটুকু জানতে চান, তা জাতীয় দৈনিকগুলো থেকেই পাচ্ছেন। সুতরাং তাঁর নিজের শহর থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রতি তাঁর দরদ বা মমত্ববোধ অথবা প্রয়োজন তৈরি হয় না।

এযাবৎকাল ঝালকাঠি থেকে যে কয়টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে, তার একটিও প্রচারের দিক থেকে না হোক, মানের দিক থেকেও বিকাশ লাভ করতে পারেনি। আবার যেকোনো তথ্য এখন মানুষ সংবাদপত্রে প্রকাশের আগেই জেনে যাচ্ছে।

তার হাতে আছে স্মার্টফোন। তার আছে ফেসবুকের মতো সোশ্যাল মিডিয়া। ফলে স্থানীয় সংবাদপত্রকে এখন জাতীয় দৈনিক এবং এই সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়।

৮. স্থানীয়দের আন্তরিকতার অভাব

একটি শহর থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ওই শহর বা জেলার মানুষের আন্তরিকতা। তাঁরা যদি এ ব্যাপারে আন্তরিক হন যে, ভালো খারাপ যা-ই হোক, এটি আমার শহরের পত্রিকা, সুতরাং একটা পত্রিকা আমার কেনা উচিত, তাহলে ওই পত্রিকাটি বিকশিত না হবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ঝালকাঠি জেলার মানুষের মধ্যে এ রকম আগ্রহ লক্ষ করা যায়নি।

৯. নীতিমালার অভাব

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ঝালকাঠি থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর কোনো লিখিত নীতিমালা নেই। পত্রিকার মালিক, সম্পাদক, প্রকাশক তথা কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই পত্রিকা চলে। এমনও অনেকে রয়েছেন, যাঁরা পত্রিকা থেকে কোনো সম্মানী পান না। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে পারলে সেখান থেকে কিছু কমিশন পান।

স্থানীয় পত্রিকায় যাঁরা রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেন, তাঁদের অধিকাংশই এটিকে ট্রেনিং পিরিয়ড হিসেবে বিবেচনা করেন। অর্থাৎ কাজ শিখে পরবর্তীতে কোনো জাতীয় দৈনিক বা টেলিভিশনের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে চান। ফলে নিয়মিত সম্মানী বা বেতন-ভাতা না পেলেও কাজ শেখার স্বার্থে তাঁরা স্থানীয় পত্রিকায় শ্রম দেন। অনেকে স্থানীয় পত্রিকায় নিছক শখের বশে।

স্থানীয় পত্রিকার নীতিমালা

সংবাদপত্র বিকাশের ক্ষেত্রে পত্রিকার সুষ্ঠু নীতিমালা একটি অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নীতিমালা বলতে বোঝায় পত্রিকার আদর্শ কী, সংবাদে কোন কোন বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে, সংবাদের ক্ষেত্রে কী কী বিষয় এড়িয়ে চলা হবে কিংবা পত্রিকায় কোন ধরনের ছবি ও সংবাদ ছাপা হবে না বা ছাপার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে কি না; নারী-শিশু-নির্যাতিত-ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ সমাজের প্রান্তিক কোনো অংশের মানুষের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি। সর্বোপরি নীতিমালা হচ্ছে একটি পত্রিকার সংবিধান। অনেক জাতীয় দৈনিকে এ

রকম লিখিত বা অলিখিত নীতিমালা থাকলেও ঝালকাঠি থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোয় এ রকম কোনো নীতিমালা নেই।

জেলা বা উপজেলা প্রতিনিধিদের ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষের কোনো লিখিত নীতিমালা নেই। কীভাবে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে, কত টাকা সম্মানী দেওয়া হবে বা আদৌ দেওয়া হবে কি না, তিনি পত্রিকা থেকে কী সুবিধা পাবেন, এসব ব্যাপারে পত্রিকা কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা বা মর্জিই হচ্ছে নীতিমালা। এ ব্যাপারে বরিশাল থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'আজকের বার্তা'র তৎকালীন বার্তা সম্পাদক আক্তার ফারুক শাহীন এবং বরিশাল থেকে প্রকাশিত আরেকটি দৈনিক 'দক্ষিণাঞ্চলে'র তৎকালীন বার্তা সম্পাদক আযাদ আলাউদ্দীন বলেন, শুধু স্থানীয় পত্রিকাই নয়, ঢাকার অনেক দৈনিকেরও লিখিত কোনো নীতিমালা নেই। তবে শাহীন জানান, তিনি তাঁর পত্রিকায় প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যাপারে সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা এবং পেশাদারিত্বকেই বেশি গুরুত্ব দেন। স্থানীয় পত্রিকার সাংবাদিকেরা পত্রিকা থেকে কী সুবিধা লাভ করেন, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, তাঁর পত্রিকার জেলা ও উপজেলা প্রতিনিধিদের প্রতিদিন দশটি করে পত্রিকা সৌজন্য দেওয়া হয়। পাশাপাশি বিজ্ঞাপনের আয় থেকে একটি অংশও তাঁদের দেওয়া হয়। ফলে ওই দশটি পত্রিকা বিক্রি এবং বিজ্ঞাপনের কমিশন মিলিয়ে মাসে হাজার দুই টাকা আয় করা কোনো সমস্যা নয়। এ ব্যাপারে আযাদ আলাউদ্দীন জানান, তাঁর পত্রিকার প্রতিনিধিদের পত্রিকা চালানোর ওপরে কমিশন দেওয়া হয়। যেমন প্রতিদিন ১০০ পত্রিকা চালাতে পারলে তাঁকে মাসে ১৫০০ টাকা সম্মানী দেওয়া হয়। এ ছাড়া ফোন ও সংবাদ পাঠানোর জন্য দেওয়া হয় ৫০০ টাকা।

ঝালকাঠির দৈনিক 'শতকণ্ঠ' পত্রিকার সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন মনজু বলেন, সাধারণত পত্রিকার কোনো লিখিত নীতিমালা থাকে না। বরং পত্রিকার মালিক, সম্পাদক, প্রকাশক তথা কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই পত্রিকাগুলো চলে।

এমনও অনেকে রয়েছেন, যাঁরা পত্রিকা থেকে আদৌ কোনো সম্মানী পাওয়া তো দূরে থাক, ন্যূনতম ফোন বা ইন্টারনেট বিলও পান না। তারপরও ওই সকল সাংবাদিক স্থানীয় পত্রিকায় কাজ করছেন কেন, এ প্রশ্নের উত্তরে বরিশাল থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'আজকের বার্তা'র তৎকালীন নলছিটি সংবাদদাতা (বর্তমানে ডিবিসি চ্যানেলের ঝালকাঠি প্রতিনিধি) আল আমিন তালুকদার বলেন, 'বহুদিন ধরে কাজ করছি। কিন্তু পত্রিকা কোনো সম্মানী দেয় না। তারপরও কাজ করছি। কেন করছি, জানি না।'

স্থানীয় পর্যায়ের অনেক সাংবাদিকই একটা বড় আশা নিয়ে কাজ শুরু করেন। তাঁদের বিশ্বাস থাকে যে, পত্রিকা কর্তৃপক্ষ অন্তত তাঁদের ন্যূনতম একটা সম্মানী দেবে। সেইসাথে নিজের পাঠানো সংবাদটি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া তথা ছাপার অক্ষরে নিজের নামটি পত্রিকার পাতায় দেখার মনোবৃত্তিও থাকে। এ ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা বা কিছুটা ক্ষমতায়িত হওয়ার প্রবণতাও কাজ করে। পক্ষান্তরে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়েও অনেকে সাংবাদিকতা শুরু করেন। যাঁরা পত্রিকা থেকে কোনো টাকাপয়সা না পেলেও বিভিন্ন বিতর্কিত ও স্পর্শকাতর সংবাদ পরিবেশন করে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করেন বা ব্ল্যাকমেল করেন, এমন অভিযোগও ওঠে।

সুপারিশ

স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোকে যেসব সংকটের ভেতর দিয়ে যেতে হয়, তা থেকে উত্তরণ খুব সহজ নয়। কিন্তু তারপরও সংশ্লিষ্ট নানা পক্ষের সাথে কথা বলে কিছু সুপারিশ পাওয়া গেছে। যেমন–

১. স্থানীয় পত্রিকাগুলো কোনো করপোরেট প্রতিষ্ঠানের সাথে বিজ্ঞাপন বা মালিকানার সম্পর্কে সম্পর্কিত নয়, ফলে তারা চাইলেই বিভিন্ন করপোরেট ও বহুজাতিক কোম্পানির জনবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করতে পারে। যেমন বিভিন্ন মোবাইল ফোন কোম্পানির অফার, কল রেট, ইন্টারনেটসহ নানাবিধ সেবা নিয়ে মানুষের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ থাকলেও বিজ্ঞাপনের স্বার্থের কারণে জাতীয় দৈনিকগুলো এসব নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে না বা করতে পারে না, স্থানীয় সংবাদপত্র সেই কাজটি অনায়াসে করতে পারে। কারণ, সাধারণত স্থানীয় সংবাদপত্রে মোবাইল ফোন কোম্পানি বা এ রকম বহুজাতিক কোম্পানি বিজ্ঞাপন দেয় না। ফলে তারা সহজেই জনগণের ক্ষোভ ও অসন্তোষের খবর প্রকাশ করে জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে পারে। পরিবেশ-প্রকৃতি-জ্বালানি-শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়েও স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো অ্যাজেন্ডাভিত্তিক খবর প্রকাশ করতে পারে, যেখানে জনস্বার্থই মূল বিবেচ্য।

২. স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো উন্নয়-ক্ষমতায়ন-অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে সত্যিকারের সাংবাদিকতার সূচনা করতে পারে। যেহেতু তাদের কাজের পরিসর ছোট, সে জন্য ইচ্ছে করলে সুনির্দিষ্ট

সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে স্থানীয় পত্রিকা সত্যিকার অর্থেই হয়ে উঠতে পারে সমাজের দর্পণ। (অধিকারী, ২০১২: ৬৬)

৩. স্থানীয় পত্রিকার বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় অর্থনৈতিক সক্ষমতা দূর করতে সরকারের বিজ্ঞাপন নীতিমালার পূর্ণ বাস্তবায়ন তথা বিজ্ঞাপন পেতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দুর্নীতি দূর করা জরুরি। এ জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোয় সুশাসন ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা দরকার। অর্থাৎ স্থানীয় সংবাদপত্র বিকাশের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সরকারের সুদৃষ্টি।

৪. স্থানীয় পাঠকের চাহিদা মাথায় রেখে পত্রিকার কনটেন্ট নির্ধারণ করা এবং সাধারণ মানুষকে স্থানীয় পত্রিকার গুরুত্ব বোঝানো।

৫. জাতীয় দৈনিকগুলোর শিকড় অনেক বড় ও পোক্ত। তারা কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করলে বা না করলেও তাদের সাধারণত টিকে থাকার সংকটে পড়তে হয় না। কিন্তু স্থানীয় পত্রিকাগুলোর ভিত্তি অতটা শক্ত নয়, সুতরাং তারা যদি রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি শুরু করে, তাহলে তার পক্ষে পাঠকপ্রিয়তা পাওয়া সম্ভব নয়।

৬. স্থানীয় পত্রিকাগুলো বেঁচে থাকে যে সকল জেলা ও উপজেলা প্রতিনিধিদের আন্তরিকতা ও ত্যাগের মাধ্যমে, তাদের ব্যাপারে সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন এবং তাদের পত্রিকা বিক্রির কমিশন বাদ দিয়ে নিয়মিত বেতনের ব্যবস্থা চালু করা দরকার। তাঁদের মধ্যে পেশাদারি সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যাতে তাঁরা অসৎ পথে পা না বাড়ান।

৭. স্থানীয় পর্যায়ের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংশ্লিষ্ট জেলার সংবাদপত্রের আর্থিক সক্ষমতা বাড়াতে এগিয়ে আসা দরকার। স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিলে স্থানীয় পত্রিকাগুলোর আর্থিক সংকট অনেক কাটবে।

পরিশেষে

বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থা, প্রশাসন, এমনকি রাজনীতিও রাজধানীকেন্দ্রিক। স্থানীয় সংবাদপত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে এটিও একটি বড় ধরনের অন্তরায়। যদিও নানা সময়ে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের কথা শোনা গেছে। ফলে ভবিষ্যতে যদি কখনো সত্যিকার অর্থেই প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ হয়, স্থানীয় উন্নয়নগুলো স্থানীয়

সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই হয়, যদি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর ও স্বাবলম্বী হয়, তখন স্থানীয় পর্যায়ের সংবাদপত্রগুলোও বিকশিত হবে। কেননা, তখন প্রতিটি অঞ্চলের সমস্যা প্রতিটি অঞ্চলকেই সমাধান করতে হবে। তখন স্থানীয় সংবাদপত্রের ওপর সাধারণ মানুষের তো বটেই, রাজনীতিবিদ, প্রশাসনসহ সবারই নির্ভরতা বাড়বে।

লেখক পরিচিতি : **আমীন আল রশীদ**, বার্তা সম্পাদক, চ্যানেল টোয়েন্টিফোর।

তথ্যসূত্র

১. জেলা তথ্য বাতায়ন, http://www.jhalakathi.gov.bd/

২. জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ (১৯৮৭), বাংলাদেশে সাংবাদিকতা, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা

৩. অধিকারী, বাধন, (২০১২), ক্ষমতা মিডিয়া আর মানুষ, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা

৪. উর্মী, সুরাইয়া বেগম ও গুপ্ত, সমুদ্র (২০০২), স্থানীয় সাংবাদিকতা: সমস্যার আলোকে দিক-নির্দেশনা, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার

৫. ঝালকাঠি প্রেসক্লাব সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকা (২০১৭), ঝালকাঠি প্রেসক্লাব

৬. সাক্ষাৎকার: হেমায়েতউদ্দিন হিমু (সাংবাদিক, ঝালকাঠি), চিত্তরঞ্জন দত্ত (সাংবাদিক, ঝালকাঠি), জাহাঙ্গীর হোসেন মনজু (সাংবাদিক, ঝালকাঠি), আব্দুর রহমান কাজল (সাংবাদিক, ঝালকাঠি), মাহবুব আলম (সাংবাদিক, ঝালকাঠি), আল আমিন তালুকদার (সাংবাদিক, ঝালকাঠি), আক্তার ফারুক শাহীন (সাংবাদিক, বরিশাল), আযাদ আলাউদ্দীন (সাংবাদিক, বরিশাল)।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা জরুরি

ড. মাহবুবা হাসনাত

ভূমিকা

প্রতিটি জাতির, প্রতিটি মানুষের আজন্ম আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতা। স্বাধীনতার মূল্য অসীম। কোনো কিছুর সঙ্গে তার তুলনা চলে না। বাঙালি জাতিরও স্বপ্ন ছিল স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের। কারণ, প্রায় দুই শ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলেও বাঙালি স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি। ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীন হলেও সাড়ে তেইশ বছরের পশ্চিম পাকিস্তানিদের শাসন, শোষণ ও নিপীড়নে নিষ্পেষিত বাঙালি প্রতি মুহূর্তে স্বপ্ন দেখে স্বাধীন দেশের। অবশেষে ৩০ লক্ষ শহীদ ও ৬ লক্ষ বীরাঙ্গনা, অগণন আহত ও প্রায় সকল বাঙালির ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের আজকের এই স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জিত হয়েছে।[১] এই স্বাধীনতার জন্য বাঙালিকে অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর

পাকিস্তান হানাদার বাহিনী দ্বারা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের ধ্বংসযজ্ঞ

পর্যন্ত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দ্বারা পরিচালিত হত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসের ছাপ বাংলাদেশের প্রতিটি শহর, গ্রাম-গঞ্জ ও অলিগলিতে রয়েছে। তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, এমন জনপদ পাওয়া যাবে না।[২] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিণত হয়েছিল গণযুদ্ধে। অনেক শিশু পর্যন্ত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর তথ্য দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছিল। কিশোর মুক্তিযুদ্ধ করেছিল।[৩] লক্ষ লক্ষ বাবা-মা, ভাই-বোন ও ছেলে-মেয়ের অমানুষিক নিপীড়ন, নির্যাতন ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা, যেগুলোর এক বৃহৎ অংশ ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি। স্থান পায়নি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের রক্তাক্ত অধ্যায়ের সকল শহীদের নাম, ঠিকানা ও পরিচয়।[৪] জানা নেই আহত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারানো বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা এবং তাঁদের গৌরবগাথা। জানা নেই লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত মানুষের মর্মবেদনার ইতিহাস। জানা নেই সেই সমস্ত বীর পিতা-মাতার কথা, যাঁরা একাধিক সন্তানকে এমনকি একমাত্র সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়ে হারিয়েছেন। একইভাবে জানা নেই সেই সব নিগৃহীত নারীর পরিসংখ্যান, যাঁরা স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার কারণে হানাদার বাহিনীর ভোগের সামগ্রী হয়েছেন, নির্বিচারে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। আমরা জানি না কত সহস্র মুক্তিযোদ্ধা দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং কত সহস্র এখনো মানবেতর জীবন যাপন করছেন।[৫] এ সবকিছুই জানা প্রয়োজন আমাদের জাতীয় স্বার্থে। কারণ, তাঁদের ত্যাগের কারণে আজ আমরা স্বাধীন দেশের গর্বিত নাগরিক। তাই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আবেদনকারী প্রতিটি ব্যক্তির প্রতিটি ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করা উচিত পুরো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার মাধ্যমে।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা জরুরি কেন

প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য তার স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। পৃথিবীর সব দেশে স্বাধীনতাসংগ্রামের পর প্রথম যে কাজটি করা হয় তা হলো জাতীয় বীরদের প্রতি স্মৃতিতর্পণ। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শুধু ব্যতিক্রম।[৬] যথার্থই কৃতজ্ঞ জাতি হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সকল নিবেদিতপ্রাণ সন্তানের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন সরকারের জাতীয় দায়িত্ব।[৭] অবশ্য এই তালিকা হবে অনেক দীর্ঘ। কারণ, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল সার্বিক অর্থেই জনযুদ্ধ। এই যুদ্ধের বড় শক্তি ছিল গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ মানুষ, যাঁরা তাঁদের জীবনের বিনিময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, নিরাপত্তা, খাদ্য ও তথ্য দিয়ে সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন, এমনকি নিজেরাও অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন।[৮] মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে শেখ

মুজিব বলেছিলেন, 'শুধু মুক্তিবাহিনী ভায়েরাই অস্ত্র হাতে সংগ্রাম করে নাই, জনগণকেও লড়তে হয়েছে স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে।'[৯] নিয়াজিও তাঁর একটি চিঠিতে বলেছেন, 'আওয়ামী লীগ একা শুধু বাংলাদেশ আন্দোলনের সাথে জড়িত নয়। বাংলাদেশের প্রায় সবাই এর সঙ্গে জড়িত।'[১০] সুতরাং এ এক বৃহৎ কর্ম। এ কর্ম সম্পাদনে বাংলাদেশ সরকারের আর বিলম্ব করা সমীচীন নয়। দেশের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে এবং আত্মগ্লানি থেকে পরিত্রাণের জন্য মুক্তিযুদ্ধে অবদানকারী প্রতিটি ব্যক্তি ও তাঁর অবদানের ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করতে হবে প্রতিটি থানার ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত।

মুক্তিযুদ্ধে অবদানকারী নায়ক-নায়িকাদের অধিকাংশ আজ আর জীবিত নেই। যাঁরা আছেন, তাঁদের অনেকেই রোগ যন্ত্রণায় ভুগে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার পর সকল অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে আর্থিক সহায়তা করা সরকারের জাতীয় দায়িত্ব। কিছু লোক এখনো ভালো আছেন। তাই সকলকে নিয়ে এখনই আমাদের এই মহান বৃহৎ কর্ম সম্পাদনে নেমে পড়া উচিত। কারণ, ১০-২০ বছর পর তাঁদের প্রায় সকলকে আমরা হারিয়ে ফেলব এবং জাতি বঞ্চিত হবে এসব গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস থেকে এবং আমরা বিবেচিত হব অকৃতজ্ঞ জাতি হিসেবে।

এবার ফিরে দেখা যাক বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের নেপথ্যের ঘটনার সারসংক্ষেপ। বাঙালির স্বাধীনতা চাওয়া কি অযৌক্তিক ছিল? কেন বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধ করতে হয়েছে? কেন তাকে এত প্রাণ বিসর্জন, এত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে।

পাকিস্তানের জন্ম

অবিসংবাদিত নেতা এ কে ফজলুল হক ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেন। ১৯৪৬ সালে অবৈধভাবে দিল্লি কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনী করে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় রূপকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়ে তা ব্যর্থ হয়।[১১] প্রখর কূটবুদ্ধিসম্পন্ন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন দেখলেন তিনি গান্ধীজির আস্থাভাজন হলেও পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর ছেলে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যতক্ষণ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব পদে আছেন, ততক্ষণ তাঁর সুউচ্চ নেতৃপদে আসা সম্ভব নয়। তাই তিনি চলনে-বলনে পুরোপুরি সাহেব হওয়া সত্ত্বেও ভারতের মুসলিম রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং অচিরেই নিজেকে মুসলিম লীগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।[১২] ১৯৪৭

সালের ১৪ আগস্ট রাতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়ে জন্ম নেয় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের। মোহাম্মদ আলী জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের ছিল দুটি অংশ। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বাংলার এ অংশের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান, অপর অংশটি পশ্চিম পাকিস্তান।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যসমূহ

'স্বাধীনতা' বা 'আজাদি' লাভের ইচ্ছার মূলে ছিল মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির প্রেরণা। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর এগুলো অর্জিত না হয়ে বরং শোষিত হতে থাকে বাংলা। ফলে জনগণের নিকট স্বাধীনতাপ্রাপ্তি প্রতিভাত হলো 'তথাকথিত আজাদি' বা 'অর্থহীন স্বাধীনতা' রূপে।[১৩] শুরু থেকেই পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানের ধনিকগোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রিভূত থাকে। এতে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থাকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী নিজেদের আয়ত্তে রাখার চেষ্টা করে। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকচক্র পূর্বাঞ্চলকে কলোনির চাইতে বেশি মর্যাদা দিতে সম্মত ছিল না। বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল কিন্তু তাদের সাথে ব্যবহার করা হতো আমেরিকার নিগ্রোদের মতো।[১৪] রাজনৈতিক ক্ষমতা বণ্টন বা অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের। আইয়ুব খানের শাসনামলে ব্যাংক, বিমা ও শিল্পের শতকরা ৮০ ভাগের মালিকানা ছিল ২২টি পরিবারের হাতে। বলা বাহুল্য, এই ২২টি পরিবারের সকলে পশ্চিম পাকিস্তানি। পাকিস্তানি শাসনে প্রায় ২৩ বছরে সোনার বাংলা শ্মশানে পরিণত হয়েছে আর পশ্চিম পাকিস্তানের মরুভূমিতে গড়ে উঠেছে বিলাসের নগর, জনপদ। ১৯৫৭ সালের এক হিসাব থেকে জানা যায়, পাকিস্তানের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম শিল্পের ৯৮ ভাগ উৎপাদিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে আর মাত্র দুই ভাগ হয় পূর্ব পাকিস্তানে। ৯৬ ভাগ জুতো উৎপাদিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে, বাকি ৪ ভাগ হয় পূর্ব পাকিস্তানে। পাঞ্জাবে শিল্পকারখানা গড়ে উঠতে লাগল আর তার কাঁচামালের জোগানদার হলো পূর্ব বাংলা। পূর্ব বাংলা থেকে গেছে কাঁচা চামড়া, কাঁচা তামাক, সর্ষের বীজ আর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসেছে তৈরি জুতো, সিগারেট, সর্ষের তেল, সাবান। প্রয়োজন মেটানোর জন্য বাঙালিকে তা উচ্চমূল্যে ক্রয় করতে হয়েছে।[১৫]

বঞ্চনার শিকার হয়েছে বাংলা আর তার সরল নিরীহ জনগণ। পশ্চিম পাকিস্তানে বেড়ে চলল কলকারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, অর্থবিত্ত আর পূর্ব পাকিস্তানে বেড়ে চলল দারিদ্র্য ও নিরন্ন ভুখা মানুষের মিছিল। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত এক

খুলনা জেলায়ই দুর্ভিক্ষে মারা যায় প্রায় ২০ হাজার লোক। ওষুধের অভাবে হাসপাতালে মৃত্যুর সংখ্যা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পেলেও মন্ত্রী বাহার সাহেব কিছু করেননি। সামান্য অসুখে মন্ত্রী-আমলারা প্রচুর অর্থ ব্যয়ে বিদেশে চিকিৎসা করান।[১৬] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ সরকার যেভাবে বাংলাকে শোষণ করেছিল, তার চেয়েও নগ্নভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি কলোনিয়াল শোষকেরা পূর্ব বাংলাকে শোষণ করেছে।[১৭] পশ্চিম পাকিস্তানি শাসন-শোষণের ফলে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান হতে দ্রুত পিছিয়ে যেতে থাকে। বাঙালিরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হতে থাকে। এসবের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ প্রতিবাদ করে এবং আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলে। আবুল ফজল হকের বক্তব্য অনুযায়ী, 'পাকিস্তান ছিল দুটি দেশ ও দুটি জনগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত একটি রাষ্ট্র। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ছিল হাজার মাইলের ভৌগোলিক ব্যবধান। দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ধর্ম ছিল একমাত্র বন্ধন। ভাষা, সাহিত্য, আচার, প্রথা, খাদ্য ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য ছিল প্রকট। হিন্দু আধিপত্যের ভীতি বাঙালি মুসলমানকে পাকিস্তানে যোগ দিতে বাধ্য করে। তবে বাঙালিরা তাদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে কিংবা বহিরাগত কোনো গোষ্ঠীর আধিপত্য মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক দমন, অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক আধিপত্যের নীতি অনুসরণ করে। ফলে বাঙালিরা পাকিস্তান থেকে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং পাকিস্তান ভেঙে কালক্রমে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।'[১৮]

ভাষা আন্দোলন

জাতির বিকাশ সাধনে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বাঙালির রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবোধ সমূলে ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানিরা প্রথম আঘাত হানে ভাষার ওপর। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম সংঘাত ঘটে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলাকে মুসলমানদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা চালায়।[১৯] ভাষার দাবিতে প্রথমে গণ-আজাদী লীগ, তমুদ্দুন মজলিশ ও ভাষা সংগ্রাম পরিষদ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে পূর্ব বাংলায় তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। বিভিন্ন সভা-সমাবেশ ও

মিছিল হয়। সরকার ১৪৪ ধারা জারিসহ সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে। ১৯৪৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদের ভাষা হিসেবে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষাকে ব্যবহারের দাবি জানান। তাঁর দাবি অগ্রাহ্য হলে ২৬ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। ২ মার্চ 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' পুনর্গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' অথচ পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬.৪০ ভাগ মানুষ ছিল বাংলাভাষী। অপরপক্ষে শতকরা ৩.২৭ ভাগ ছিল উর্দুভাষী।[২০] সভাস্থলেই ছাত্ররা 'না, না' বলে তাঁর উক্তির প্রতিবাদ জানান। তাঁরা মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হন। পাকিস্তান সরকার আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের উদ্যোগ নিলে প্রতিবাদ আরো তীব্র হয়। এত কিছুর পরও ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে খাজা নাজিমুদ্দিন জিন্নাহকে অনুকরণ করে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে ধর্মঘট হয় ও আন্দোলন-সংগ্রাম চলতে থাকে। পাকিস্তান সরকার ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারিসহ সভা-সমাবেশ, মিছিল নিষিদ্ধ করে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকায় ছাত্র-জনতার সমাবেশ

এর বিরুদ্ধে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে মিছিলের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এতে আবুল বরকত, সালাম, রফিক, আবদুল জব্বারসহ অনেকে

শহীদ হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। পাকিস্তান সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী শক্তির দম্ভে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল বাঙালির বাংলা ভাষার দাবিকে। বাঙালি রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠা করল বাংলা ভাষাকে। বিশ্বের মধ্যে বাঙালি একমাত্র জাতি, যাদের ভাষার জন্য রক্ত দিতে হয়েছে। ভাষা আন্দোলন বাঙালিকে মর্যাদা ও মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস জোগায়। মূলত ভাষা আন্দোলন থেকেই শুরু হয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও গণজোয়ার। জেগে ওঠে প্রমত্ত প্রমিথিউস ও ফিনিক্স, আমরা দেখি ইকারুসের উজ্জ্বল আকাশ, দর্পচূর্ণ হয় প্রমত্ত জিউসের। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ গণরায়, ৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬-র ছয় দফা, ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ মহান মুক্তিযুদ্ধ।[২১]

শুধু ভাষা নয়, বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ওপরও তারা হামলা চালায়। আইয়ুব খান ১ বৈশাখকে ইসলামবিরোধী আখ্যা দেন। ধর্মীয় দোহাই দিয়ে শ্যামা সংগীত, ভজন, কীর্তন রেডিওতে পরিবেশন নিষিদ্ধ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অমুসলিম ও ভারতীয় হওয়ার অপরাধে রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ করা হয়। রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ হলে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে বাংলায়। প্রতিবাদ সভা, বিক্ষোভ, মিছিল, মিটিং চলতে থাকে। ভাষাতত্ত্ববিদ শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বললেন, 'ভাষার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে, তাতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বিরাজমান।' বাংলার কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-জনতা এক কণ্ঠে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে যেমন পদ্মা, মেঘনা, যমুনাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায় না, তেমনি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে রবীন্দ্রনাথকে পৃথক করা সম্ভব নয়।'[২২] বাঙালির কঠিন সংগ্রামে বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি রক্ষা পেল।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রায় একই স্তরে ছিল। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অনুসৃত নীতির ফলে দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয় পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান হতে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচারের কারণে এই বৈষম্যের সৃষ্টি

হয়। এক হিসাব অনুসারে ১৯৪৮-৬৯ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান হতে মোট ৪১৯ কোটি টাকার সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা হয়।[২৩] মুদ্রা ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছিল। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্টেট ব্যাংক ও অন্য ব্যাংকসমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় অর্থ পাচার হতো সহজে।

পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৪ ভাগ লোক বাস করত পশ্চিম পাকিস্তানে এবং তাদের জন্য উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ রাখা হতো শতকরা ৭৭ ভাগ। অপরপক্ষে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ লোক পূর্ব বাংলায় বাস করত এবং তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হতো শতকরা ২৩ ভাগ মাত্র।[২৪] কিছু উদাহরণের মাধ্যমে বৈষম্যের বিষয়টি আরো পরিষ্কার করা যেতে পারে। ১৯৪৯-৫০ সালে পাকিস্তানের উন্নয়নমূলক কাজে ৩৫ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা এবং ১৯৫০-৫১ সালে ৪৬ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। কিন্তু এই টাকার নব্বই ভাগই খরচ হয় পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। ১৯৫১ সালে ৫২ হাজার টন লোহা আমদানির সবটাই যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব বাংলাকে দেওয়া হয়েছে মোট ৭৯,৫৫৫ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছে ১১৪,৩৫০ কোটি টাকা।[২৫] ১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে ১৯৫৭-৬০ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান মোট বাজেট বরাদ্দের ১১৩ কোটি ৩ লাখ টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তান ৫০০ কোটি টাকা লাভ করেছিল। পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতি ও শোষণের কারণে পশ্চিম পাকিস্তান সম্পদশালী হয়েছে এবং পূর্ব বাংলা হয়েছে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য

পূর্ব পাকিস্তানের টাকায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে; অথচ প্রতিরক্ষা খাতের শতকরা ৯৮ ভাগ খরচ হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য। পূর্ব পাকিস্তান চরমভাবে বঞ্চিত হয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীতে বাঙালিদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য বিরাজ করছিল। প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিনটি সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে কোনো অস্ত্রাগার তৈরি হয়নি। মোট অফিসারের মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ, সাধারণ সৈনিকের শতকরা ৪ ভাগ মাত্র ছিলেন বাঙালি। নৌবাহিনীর উচ্চপদে শতকরা ১৯ ভাগ, নিম্নপদে ৯ ভাগ এবং বিমানবাহিনীর পাইলটদের শতকরা ১১ ভাগ ও টেকনিশিয়ানদের মধ্যে শতকরা

১.৭ ভাগ মাত্র ছিলেন বাঙালি। একই যোগ্যতায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের চাকরি বা পদোন্নতি হলেও পূর্ব পাকিস্তানিদের জন্য তা ছিল কঠিন।

প্রশাসনিক বৈষম্য

পাকিস্তানের প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি চরম বৈষম্য ছিল। প্রশাসনের দায়িত্বে পূর্ব পাকিস্তানের ভূমিকা ছিল অতি নগণ্য। দেশরক্ষা, স্বরাষ্ট্র ও তথ্য ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ভূমিকা ছিল যথাক্রমে শতকরা ৮.১, ২২.৭ ও ২০.১ ভাগ মাত্র। কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস, ফরেন সার্ভিস ও সৈন্যবাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানের জনবল ছিল যথাক্রমে শতকরা ৮৪, ৮৫ ও ৯৫ ভাগ এবং পূর্ব পাকিস্তানের ছিল শতকরা ১৬, ১৫ ও ৫ ভাগ। বিদেশে মিশনপ্রধান পশ্চিম পাকিস্তানের ৬০ জন আর পূর্ব পাকিস্তানের মাত্র ৯ জন। প্রধান সারির সেনা অফিসার পশ্চিম পাকিস্তানের ১৬ জন আর পূর্ব পাকিস্তানের ১ জন মাত্র। পিআইএ আঞ্চলিক ম্যানেজার পশ্চিম পাকিস্তানের ৫ জন এবং পূর্ব পাকিস্তানের কেউ ছিল না।

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

১৯৪৭ সালের পূর্বে পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় অগ্রসর ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পশ্চিম পাকিস্তান শিক্ষা খাতে পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি বাজেট বরাদ্দ পায়। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে নতুন অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং পূর্ব পাকিস্তানের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলায় ১টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৫টি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করে। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব বাংলার জনসংখ্যা ২ কোটি বেশি।[২৬] পূর্ব বাংলায় কোনো টেক্সটাইল কলেজ ছিল না কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে টেক্সটাইল কলেজ ছিল ৮টি।[২৭] ১৯৫৪-৬৩ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পূর্ব পাকিস্তান পেয়েছে ১,৯১,০০,০০০ টাকা, একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে ৭,৬২,০০,০০০ টাকা। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য প্রতিবাদ করলে তাঁকে পাকিস্তান বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার ডিরেক্টরের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

ওপরে প্রদত্ত তথ্যসমূহ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানকে কিরূপ নগ্নভাবে বঞ্চনা, শোষণ, লুণ্ঠন করেছে। পাকিস্তান ইসলামিক

রাষ্ট্র। ইসলাম বলে, 'সারা দুনিয়ার মুসলমান ভাই ভাই'। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এই ধর্মীয় জিগির শোষণ, লুণ্ঠন ও বঞ্চনার হাতিয়ার হয়েছে। অতিরিক্ত শোষণ, বঞ্চনার কারণে বাঙালিরা অর্থনৈতিকভাবে ক্রমাগত দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে এবং তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে ক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে।

১৯৭০ সালের নির্বাচন ও বাঙালির বিজয়

১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পাকিস্তান শাসকদের শোষণের হাত থেকে মুক্তি লাভের আশায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট প্রদান করে। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনেও ৩১০টির মধ্যে ২৯৮টি আসন লাভ করে।[২৮] প্রশাসনের ধর্মীয় জিগির তুলেও কোনো লাভ হয়নি। কারণ, ইতিমধ্যে বাঙালিরা বুঝে গেছে মুসলমান ভাইদের অধীনে তাদের উন্নয়ন হবে না। তারা আরো শোষিত হবে। বাঙালিরা ভোটের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শাসন বর্জন করে।

ক্ষমতা হস্তান্তরে চক্রান্ত

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সত্ত্বেও পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগকে

স্বাধীনতার দাবিতে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু

ক্ষমতা হস্তান্তরে নানা চক্রান্ত করে। নির্বাচন শেষে ঢাকার গভর্নমেন্ট হাউসের নৈশভোজে এসে এক জেনারেল সদম্ভে বলেছিলেন, 'চিন্তা কোরো না, আমরা এসব কালো বেজন্মাদের আমাদের ওপর শাসন চালাতে দেব না।'[২৯] ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। ভুট্টো ঢাকার অধিবেশনে যোগদান করতে অস্বীকার করলে ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর ঘোষণাকে অজুহাত দেখিয়ে ৩ মার্চের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এসবই ছিল ভুট্টো-ইয়াহিয়ার চক্রান্ত। আসগর খান তাঁর বইতে বলেছেন, ১৯৭০-এর নির্বাচন বিরোধী ছিলেন ভুট্টো। তিনি ইয়াহিয়াকে নিয়ে দেশ শাসন করতে চেয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে কী হবে, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কোনো সমস্যা হবে না, হাজার বিশেক লোক খতম করে দিলেই সমস্যার সমাধান হবে।[৩০] সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা না করে অধিবেশন স্থগিত করায় পূর্ব বাংলার জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারা দেশে হরতাল পালিত হওয়ায় সকল সরকারি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। হরতাল চলাকালে পুলিশের গুলিতে বহু লোক হতাহত হয়। এমন পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। বাঙালি জাতির ইতিহাসে এ ভাষণ এক স্মরণীয় দলিল। ৭ মার্চের ভাষণ পৃথিবীর ইতিহাসে ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষণের মর্যাদা লাভ করে। ৭ মার্চের ভাষণ থেকে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা এবং মুক্তিযুদ্ধের দিকনির্দেশনা পায়।

বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনার নীলনকশা

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সকল স্তরের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সকল অফিস-আদালত, কলকারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টো ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে। সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্য যে প্রস্তুতি ও সময়ের প্রয়োজন ছিল, তার জন্য পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রহসনমূলক আলোচনার আয়োজন করে।[৩১] ১৭ মার্চ টিক্কা খান, রাও ফরমান আলী 'অপারেশন সার্চলাইট' বা বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনার নীলনকশা তৈরি করে। পাকিস্তান সরকার গণতান্ত্রিক সমঝোতার পথ পরিহার করে হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টো ২৫ তারিখে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে

ও হত্যা করে বহু মানুষকে। ২৫ মার্চ রাতে পৃথিবীর ইতিহাসে বর্বরতম গণহত্যা সংঘটিত হয়। পাকিস্তানিরা বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ করে এবং জীবন্ত দগ্ধ করে নারী, শিশু, বৃদ্ধসহ অগণিত মানবসন্তান। এদিন পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প, পিলখানা ইপিআর ক্যাম্প, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আঘাত হানে এবং নৃশংসভাবে হত্যা করে কয়েক সহস্র মানুষকে। এ দিনটি ইতিহাসে '২৫ মার্চের কালরাত্রি' নামে পরিচিত।

স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা

শত প্ররোচনা সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক সমাধান চেয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানিরা তাঁর চাওয়ার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেনি, বরং তাঁকে দেওয়া হয়েছে গণহত্যা। সে কারণে ২৫ মার্চ স্বাধীনতার ডাক দেওয়া ছাড়া বঙ্গবন্ধুর কোনো উপায় ছিল না।[৩২] ২৫ মার্চের রাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ওয়্যারলেসযোগে তা পাঠিয়ে দেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী শোনামাত্রই দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। শুরু হয়ে যায় পাকিস্তানি সশস্ত্র সেনাদের সাথে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক, ইপিআর, পুলিশ, আনসার ও নিরস্ত্র কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রছাত্রীসহ সারা দেশের সাধারণ মানুষের এক অসম লড়াই, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে মহান মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এতে ৩০ লক্ষ বাঙালি শহীদ হয়, লক্ষ লক্ষ নারী তাঁদের সম্ভ্রম হারান, অগণিত মনুষ হয় আহত। প্রায় সব বাঙালি অত্যাচার, নির্যাতনে হয় নিষ্পেষিত। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালিদের ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড, নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগসহ সকল ধরনের অপরাধ সংঘটিত করে। নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশুসহ নির্বিচারে সকলকে নির্মমভাবে হত্যা করে। শিশুসহ বিভিন্ন শ্রেণির, বিভিন্ন বয়সের নারীকে ধর্ষণ এবং শেষে তাঁদের অনেককে হত্যা করে। গ্রামের পর গ্রাম, ফসলের খেত জ্বালিয়ে দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণে টিকতে না পেরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বিভিন্ন এলাকা থেকে পালাবার সময় অক্ষমতার তীব্র যন্ত্রণায়, পরাজয়ের প্রচণ্ড আক্রোশে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শ্মশানে পরিণত করে দিয়ে যায়

পুরো জনপদ। পৃথিবীর ইতিহাসে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার স্বাক্ষর খুবই বিরল।[৩৩] বীর বাঙালির চতুর্মুখী আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয় নিশ্চিত জেনে তারা বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। অবশ্য যুদ্ধের প্রথম থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনতাকামী মুক্তবুদ্ধির প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের তারা হত্যা করতে থাকে। বাঙালিকে নিঃস্ব করাই ছিল তাদের হীন উদ্দেশ্য। সহায়-সম্পদে নিঃস্বতার চেয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় নিঃস্বতাও কম ক্ষতির নয়।[৩৪] এ ক্ষেত্রে ডা. লুৎফর রহমানের একটি উদ্ধৃতি রয়েছে তা হলো, 'যদি কোন জাতিকে ধ্বংস করতে চাও তবে সে জাতির শিক্ষিত ও জ্ঞানী মানুষের মাথা কাটো।'[৩৫] বাঙালি জাতি যেন পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে, অবহেলিত, নিগৃহীত অনগ্রসর জাতিতে পরিণত হয়, এ জন্য তারা বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করে। পাকিস্তানিরা বাঙালি হত্যায় সব সময় বুলেটও ব্যবহার করেনি। কখনো বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে, আবার কখনো ধারালো ছুরি দিয়ে নির্মমভাবে জবাই করে হত্যা করে। হত্যার পর এসব হতভাগ্যদের লাশ নদীতে, খালে-বিলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আবার কখনো কবরের নামে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে।[৩৬] বাংলায় এমন কোনো জনপদ নাই, যা তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, এমন কোনো অপকর্ম নাই, যা তারা করেনি। তাদের বর্বরতার ইতিহাস তৈমুর-চেঙ্গিসের বাহিনী, মার্কিন বাহিনীর নাগাসাকি-হিরোশিমার কাহিনিকেও হার মানিয়েছে। হার মানিয়েছে ইহুদি হত্যাযজ্ঞের নায়ক আইকম্যানকেও।[৩৭]

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শুধু যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হত্যা, নির্যাতন, ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তা নয়, তাদের দোসর ও সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে এ দেশের স্বার্থপর, সুবিধাবাদী, পথভ্রষ্ট কিছু ব্যক্তি, যারা মুক্তিযুদ্ধকালীন রাজাকার, আলবদর, আলশামস নামে পরিচিত ছিল। এদের অনেকে স্বেচ্ছায়, অনেকে প্রলোভনে পড়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী হয়। ঘরের এমন পথভ্রষ্ট শত্রুরা যদি পাকিস্তানিদের সহায়তা না করত, তবে বাংলাদেশ আরো স্বল্প সময়ে স্বাধীন হতো এবং ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণও কম হতো।

পাকিস্তানি বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত অপরাধগুলো তারাও করেছে। দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাদের নৃশংসতার একটি চিত্র এ রকম–'হানাদার পাক সেনাদের আত্মসমর্পণের পর যখন আলবদররা পালিয়ে যায়, তখন তাদের হেডকোয়ার্টারে পাওয়া যায় বস্তাভর্তি চোখ। আলবদরদের খুনিরা তাদের (বাঙালিদের) হত্যা করে চোখ তুলে বস্তা ভর্তি করে রেখেছিল।'[৩৮] ১৯৭১ সালের

২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের সহযোগীদের দ্বারা সংঘটিত এরূপ হাজার হাজার লোমহর্ষ বর্বর ঘটনা রয়েছে। এই সমস্ত কুখ্যাত অপরাধীর বিচার করা বাংলাদেশ সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানি বাহিনীর নারকীয় তাণ্ডব বিশ্ববিবেককে নাড়া দেয়। পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের দ্বারা সংঘটিত হত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণের বিরুদ্ধে বিশ্ববিবেক জাগ্রত হয়। বিভিন্ন দেশ পাকিস্তানিদের প্রতি নিন্দা ও প্রতিবাদের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। এ ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

ঐতিহাসিক বিজয়

অবশেষে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালির বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। বীর

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পন

বাঙালি সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাড়ে তেইশ বছরের শাসন, শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়ন থেকে এবং নয় মাসব্যাপী গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণসহ সকল ধরনের অপকর্ম থেকে পরিত্রাণ লাভ, অর্থাৎ বিজয় অর্জন করে। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বিশাল

১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন দেশে মুক্ত বাঙালির বিজয়োল্লাস

হর্ষোৎফুল্ল জনতার উপস্থিতিতে পরাজিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সেনাপতি লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ নিয়াজি ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর নিকট ৯৩ হাজার সৈন্য, অফিসারসহ আত্মসমর্পণ করে।[৩৯]

বাঙালি বীরের জাতি

ইতিহাস প্রমাণ করেছে বাঙালি বীরের জাতি। কোনোকালেই বাংলা বিদেশি শাসন ও শোষণকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়নি। এর জন্য তাকে অনেক রক্ত ও মূল্য দিতে হয়েছে। আদিম যুগে বাংলার আদিবাসীরা আর্যদের রুখেছে। আর্যরাজের বিরুদ্ধে হয়েছে কৈবর্ত বিদ্রোহ। মোগল আমলে দিল্লির বাদশাহি মসনদকে অস্বীকার করেছে বাংলার ঈশা খাঁ, চাঁদ রায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, লক্ষ্মণ মাণিক্যসহ অনেকে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ১৭৭৬ সালে কৃষক বিদ্রোহ, ১৭৬০-১৮০০ সালের ফকির বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ, ১৮৬০ সালে সমাপ্ত নীল বিদ্রোহ বিদ্রোহী বাংলার বিদ্রোহের ইতিহাসে রক্তস্বাক্ষর।[৪০] বীর তিতুমীরের স্বাধীনতা সংগ্রাম, হাজি শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনও উল্লেখযোগ্য। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত একশ বছরের ইতিহাস ছিল সংগ্রামের ইতিহাস। এই সময়ে বাংলার

সর্বত্র জনগণ বিদেশি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে কখনো সংঘবদ্ধভাবে বিদ্রোহ করেছে, লড়াই করেছে। কখনো তারা কিছুটা সাফল্য পেয়েছে, আবার কখনো ব্যর্থ হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আরো আন্দোলন ও ত্যাগের বিনিময়ে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে ব্রিটিশরা ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ ছেড়ে গেলেও বাঙালির ললাট থেকে মুছে গেল না শোষণ, বঞ্চনার ইতিহাস। সাড়ে তেইশ বছরের পাকিস্তানি শাসন-শোষণে বাংলা অর্থ-বিত্ত সব হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হলো। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি রক্ষা করতেও বাঙালিকে বুকের রক্ত দিতে হয়েছে, আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হয়েছে। অবশেষে ৩০ লক্ষ বীরের আত্মাহুতি ও লক্ষ লক্ষ বীর-বীরাঙ্গনার ত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা। বাংলা বীর প্রসবিনী। বীর প্রসবিনী বাংলা যুগে যুগে, কালে কালে জন্ম দিয়েছে শত শত, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বীর-বীরাঙ্গনাকে, যারা স্বাধীনতার বেদিমূলে আত্মোৎসর্গ করে গেছে হাসিমুখে।[৪১]

বাঙালি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ দুর্জয় দুর্বার জাতি। এ জাতিকে পদানত করে রাখার শক্তি কারো নেই। দেশমাতৃকার জন্য যে জাতির লক্ষ লক্ষ বীরযোদ্ধা নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারে, সে জাতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তো স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭১ সালে আগরতলা হাপানিয়া ক্যাম্পের নিকট মুক্তিবাহিনীর এক ট্রানজিট ক্যাম্প পরিদর্শনে যান। সেখানে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা, খাওয়াসহ বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে সমাধানের আশ্বাস দেন। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারা চিৎকার করে উঠল, 'না না ম্যাডাম, আমরা ভাত খাবার বর্তন চাই না, আরামে ঘুমুতে চাই না–আমরা শুধু অস্ত্র চাই, আপনি শুধু আমাদের অস্ত্র দিন। আর একটু আধুনিক উন্নত ট্রেনিং চাই।'[৪২] অল্পবয়সী এসব অকুতোভয় বীরযোদ্ধার আবদার শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে যান। তিনি বুঝে যান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সময়ের ব্যাপার মাত্র। ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন বাঙালির অকৃত্রিম বন্ধু। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় এক কোটি বাঙালি শরণার্থীকে তাঁর সরকার আশ্রয় দান করে। ভারত সরকার মানবিক কারণে বাঙালিদের সর্বাত্মক সহায়তা করলেও প্রথমে অস্ত্র হাতে দেয়নি। কারণ, ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন দক্ষ রাজনীতিবিদ। আন্তর্জাতিক কারণে তিনি স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যেতে চাননি। তবে তিনি জানতেন, কোনো জাতিকেই পদানত করে রাখা সম্ভব নয়, যদি সে আত্মোৎসর্গে বলীয়ান হয়। যখন তিনি দেখলেন বাঙালি স্বাধীনতার জন্য মরিয়া, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত

পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধে শত শত তরুণ প্রাণ হারাচ্ছে, তবু হাজার হাজার তরুণ মুক্তিযুদ্ধের খাতায় নাম লেখাচ্ছে নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও দেশকে হানাদার মুক্ত করার জন্য, অবশেষে ইন্দিরা গান্ধী সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের ৬৭ কোটি টাকার অস্ত্র সরবরাহ করে। এই অস্ত্র পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ে হানাদারদের ওপর। একে একে নতুন নতুন এলাকা দখল করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে।[৪৩] সারা পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রয় বীর বাঙালির ত্যাগ ও বীরত্বগাথায়। এই বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের, বিজয় গৌরবে পুরো ইতিহাস রচনা সকলের কাম্য।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে ১৯৭৭ সালে। ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও শুধু স্বাধীনতাযুদ্ধ-সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশ করে ১৫ খণ্ডে।[৪৪] এতে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস রচনার বৃহৎ কর্ম বাদ পড়ে যায়। অথচ তাঁদের ত্যাগ ও বীরত্বগাথা লিপিবদ্ধ করা উচিত ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য। যাতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম জাতি তাঁদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে পারে। কারণ, তাঁরা আমাদের জাতীয় গৌরব। তাঁদের ত্যাগের কারণে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রটির অভ্যুদয় ঘটে। মুক্তিযুদ্ধের ওপর অসংখ্য গ্রন্থ, উপন্যাস, চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র, নাটক ইত্যাদি রচনা হলেও মুক্তিযুদ্ধের পুরো ইতিহাস রচিত হয়নি, যা অনেক আগেই রচনা হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

আমাদের সংগ্রাম আর প্রতিরোধের, ত্যাগ স্বীকার আর নির্যাতন ভোগের কাহিনি ছড়িয়ে আছে দেশের প্রতিটি শহর-বন্দরের অলিতে-গলিতে, ৬৮ হাজার গ্রামের অধিকাংশ পরিবারে। এসবের কোনো সংখ্যা আমাদের জানা নেই অথচ সেসব কাহিনি আমাদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেগুলোর সমাহারই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, যার বহু অংশ এখনো ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি। এক ব্রিটিশ মন্ত্রী বলেছেন, যে জাতি তার অতীত ভুলে যায়, তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই, কারণ, সে তার আত্মপরিচয় হারায়।[৪৫] ইতিহাস প্রমাণ করে, বাঙালি এক মহান জাতি। আমরা আমাদের অতীত ভুলে যেতে চাই না। জাতীয় স্বার্থেই আমাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদানকারী প্রতিটি ঘটনা এবং ঘটনার নায়ক-নায়িকাকে ইতিহাসের পাতায় স্থান দেওয়া উচিত। তাঁদের কাজের স্বীকৃতি এবং

অসচ্ছলদের সহায়তা করা উচিত, যাতে মুক্তিযুদ্ধে অবদানকারী কোনো ব্যক্তিকে মানবেতর জীবন যাপন করতে না হয়। কারণ, তাঁদের ত্যাগের কারণেই আজকে আমরা স্বাধীন ও জাতীয় অগ্রগতিতে বিশ্বে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জনকারী দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম দেশের গর্বিত নাগরিক।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার সম্ভাব্য পদ্ধতি

বর্তমানে মুখের কথার ইতিহাস বা ওর‍্যাল হিস্ট্রির বিষয়টি স্বীকৃতি পাচ্ছে। এ নিয়ে কিছু কাজও হয়েছে।[৪৬] মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় ব্যবহার করা যেতে পারে এই পদ্ধতি। প্রথমে প্রতিটি গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ, সুধী সমাজ ও সাধারণ ব্যক্তিদের নিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদানকারী ব্যক্তিবর্গের নাম, আনুমানিক বয়স, পেশা ও ঠিকানা লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। ঠিকানা অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তিকে শনাক্ত করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও সাথে রেকর্ড/ভিডিও করা যেতে পারে। সেই সময়ের ঘটনার সপক্ষে কোনো ডকুমেন্ট বা ফটোগ্রাফ থাকলে তা-ও সংগ্রহ করা যেতে পারে। যদি ব্যক্তি মৃত হয়, তবে তার নিকটাত্মীয়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও রেকর্ড করা যেতে পারে। উভয় ক্ষেত্রের প্রাপ্ত তথ্য একাধিক উৎস থেকে যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করা আবশ্যক। সবশেষে মুক্তিযুদ্ধে অবদানকারী ব্যক্তিবর্গের নাম ও প্রাপ্ত ঘটনাগুলোকে গ্রাম, ইউনিয়ন বা থানা পর্যায়ে সাজিয়ে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা যেতে পারে। এটি হবে একটি বৃহৎ কর্মযজ্ঞ, যাতে দীর্ঘ সময় ও প্রচুর অর্থ ব্যয় এবং বহু জনবল আবশ্যক হবে। তবু জাতীয় স্বার্থে আমাদের এখনই এ বৃহৎ কর্ম সম্পাদনে নেমে পড়া উচিত। কারণ, ১০-২০ বছরের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদানকারী প্রায় সকলকে আমরা হারিয়ে ফেলব চিরতরে।

লেখক পরিচিতি : ড. মাহবুবা হাসনাত, লেখক

তথ্যসূত্র

১। মামুন, মু. (২০১৬) ১৯৭১ অবরুদ্ধ দেশে প্রতিরোধ, অনন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১১।

২। সাগর, খু. আ. (২০০৪) রণাঙ্গনে মুক্তিসেনা ১৯৭১, শোভা প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৪।

৩। Documentary on Liberation war of Bangladesh 1971 1 of 3.
৪। হাবিব, হা. (২০১১) মুক্তিযুদ্ধ পালাবদলের ইতিহাস, সালমা বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৯।
৫। কালের কণ্ঠ, ১৩ জানুয়ারি ২০১৯।
৬। মামুন, মু. (২০১০) মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র। এক, সুবর্ণ, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২০।
৭। চৌধুরী, শা. হু, (১৯৮৫) মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর, বিজয় প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৭৭।
৮। হাবিব, হা. (২০১১) মুক্তিযুদ্ধ পালাবদলের ইতিহাস, সালমা বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৪।
৯। রহমান, মি. মু, (২০১৫) জাতির জনকের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা, গ্লোবাল পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১২০।
১০। মামুন, মু. (২০১১) মুক্তিযুদ্ধের ছিন্ন দলিলপত্র, অনন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৩।
১১। রহমান, হা. হা সম্পাদিত (২০০৩) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, অষ্টম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, পৃষ্ঠা ৪।
১২। ফিরোজ, আ. সম্পাদিত (২০১২) '৭১ শেখ মুজিব বাংলাদেশ, মিজান পাবলিশার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ ১৭।
১৩। ড. খান, ই (২০০৭) মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, কাশবন প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৮।
১৪। মামুন, মু. (২০১১) পাকিস্তানি জেনারেলদের মন বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ, সময় প্রকাশন, ঢাকা, পৃ ৯৫।
১৫। হক, গা. (২০০৯) এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জোনাকী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২২-২৬।
১৬। রহমান, হা. হা. সম্পাদিত (২০০৩) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, পৃষ্ঠা ৩৮১।
১৭। রহমান, শে. মু. (২০১৭) কারাগারের রোজনামচা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৮৯।
১৮। চৌধুরী, আ. হা. (২০১২) যুদ্ধে যুদ্ধে একাত্তরের নয় মাস, কাকলী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩৮।
১৯। চৌধুরী, আ. হা. (২০১২) যুদ্ধে যুদ্ধে একাত্তরের নয় মাস, কাকলী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩৮।
২০। হোদা, মো. কা. (২০১২) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উৎস অনুসন্ধান, বাংলা একাডেমি, পৃষ্ঠা ২।
২১। ফিরোজ, আ. সম্পাদিত (২০১২) '৭১ শেখ মুজিব বাংলাদেশ, মিজান পাবলিশার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ ২৩।
২২। হক, গা. (২০০৯) এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জোনাকী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩৮।

২৩। চৌধুরী, আ. হা. (২০১২) যুদ্ধে যুদ্ধে একাত্তরের নয় মাস, কাকলী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩৮।

২৪। হোদা, মো. কা. (২০১২) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উৎস অনুসন্ধান, বাংলা একাডেমি, পৃষ্ঠা ৪-৫।

২৫। হক, গা. (২০০৯) এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জোনাকী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৫।

২৬। হোদা, মো. কা. (২০১২) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উৎস অনুসন্ধান, বাংলা একাডেমি, পৃষ্ঠা ৪।

২৭। রহমান, হা. হা. সম্পাদিত (২০০৩) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, পৃষ্ঠা ৩৮১।

২৮। হাসনাত, আ. (২০০৯) স্বাধীনতা '৭১, শিখা প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৪।

২৯। ড. হোসেন, কা. (১৯৯৮) মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৪৫।

৩০। মামুন, মু. (২০১১) পাকিস্তানি জেনারেলদের মন বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ, সময় প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৭৯।

৩১। হোদা, মো. কা. (২০১২) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উৎস অনুসন্ধান, বাংলা একাডেমি, পৃষ্ঠা ১২।

৩২। মাহমুদ, আ. (২০০৯) বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ অভিন্ন সত্তা, লেখনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১২৫।

৩৩। শফী, বে. মু. (১৯৯২) স্বাধীনতা আমার রক্ত ঝরা দিন, অনুপম প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৭১।

৩৪। প্রথম আলো, ১৪ ডিসেম্বর ২০১৮।

৩৫। প্রথম আলো, ১৪ ডিসেম্বর ২০১৮।

৩৬। বিশ্বাস, সু. (২০০০) একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর, অনুপম প্রকাশনী বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৫-১৭।

৩৭। রহমান, হা. হা. সম্পাদিত (২০০৩) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, অষ্টম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, পৃষ্ঠা ৩৭০।

৩৮। মামুন, মু. (২০১৬) ১৯৭১ অবরুদ্ধ দেশে প্রতিরোধ, অনন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩৫।

৩৯। প্রফেসর আহমদ. শা, সরকার, মো. ও ড. মঞ্জুর. নু. ই. সম্পাদিত (২০০৪) বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৬৫।

৪০। হক, গা. (২০০৯) এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জোনাকী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৭।

৪১। হক, গা. (২০০৯) এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জোনাকী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৯।

৪২। শফী, বে. মু. (১৯৯২) স্বাধীনতা আমার রক্ত ঝরা দিন, অনুপম প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৯৩।

৪৩। চৌধুরী, শা. হু. (১৯৮৫) মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর, বিজয় প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৯৬।

৪৪। রহমান, হা. হা. (সম্পাদিত) (২০০৯) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, পৃষ্ঠা ৩।

৪৫। মামুন, মু. (২০১০) মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র। এক, সুবর্ণ, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৭।

৪৬। মামুন, মু. (২০১১) মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র। দুই, সুবর্ণ, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৩।

জনমত বিনির্মাণ : গণমাধ্যম পরিপ্রেক্ষিত

দেওয়ান মোহাম্মদ আহসান হাবীব

মানুষ অভিযোজনক্ষম প্রাণী। সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত সামাজিক প্রেক্ষাপট আর বয়সের ঊর্ধ্বগতি ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তিকে ক্রমেই বাড়িয়ে তোলে। আর তাই, আবর্তিত সময়ের সাথে সাথে আচরণের গতি ও মাত্রাবোধে আসে পরিবর্তন। এ প্রসঙ্গে শহীদ মুনীর চৌধুরীর বিখ্যাত উক্তি প্রণিধানযোগ্য, 'মানুষ মরে গেলে পচে যায়, বেঁচে থাকলে বদলায়, কারণে অকারণে বদলায়।'

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও চিন্তার পরিসর দিয়ে প্রতিটি মানুষের আচরণ বোধ করি নিয়ন্ত্রিত ও প্রকাশিত হয়। জীবনের গল্পে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির আচরণ ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটা খুবই স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক হচ্ছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আচরণের নেতিবাচক বিবর্তন। সামাজিক আচরণ এবং মূল্যবোধের ক্রম উন্নতির জন্য সমাজে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, সমাজের জন্য অবশ্যই মঙ্গলজনক। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং এই লক্ষ্যে কাজ করা সমাজের স্বাভাবিক প্রবণতা। প্রবণতার এই ধারাবাহিক প্রয়োগের ফলেই সমাজের বিকাশ।

সভ্যতার বিবর্তনে একসময় সমাজে দিশা সৃষ্টি করতেন রাজা, গোত্রপ্রধান কিংবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধর্মগুরু। সমাজ কিংবা গোত্রের সকলেই প্রভাবিত হতেন তাঁর নেতৃত্বে। অস্তিত্বের প্রয়োজনেই এটি ছিল স্বীকৃত হায়ারার্কি। ১৩২৭ খ্রিষ্টাব্দের কথা। ফরাসি সিউলফখ্যাত রানি ইসাবেলা ইংলিশ রাজার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং নিজ স্বামী রাজা দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আর্চ বিশপ অব ক্যান্টারবেরি ওয়াল্টার রেনল্ড জনগণকে খেপিয়ে তুলতে রাজা দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের বিরুদ্ধে প্রচার করতে লাগলেন নিজস্ব অভিযোগনামা...Vox populi, vox dei 'সাধারণের ইচ্ছেই

ঈশ্বরের ইচ্ছে'। রেনল্ড তাঁর অভিযোগনামার মাধ্যমে কৌশলে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করার প্রয়াস রচনা করেন। বলতে থাকেন, আসুন এই অযোগ্য রাজার হাত থেকে আমাদের পিতৃভূমিকে মুক্ত করি। সাধারণ জনগণ উদ্দীপিত। জনগণের ইচ্ছে মানেই 'ঈশ্বরের ইচ্ছে', এমন অশ্রুতপূর্ব অসম্ভব বাক্যে আবেগতাড়িত হয়ে উঠেছেন সকলে। নিজেদের সব সামর্থ্য দিয়ে যুক্ত হলেন নতুন রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের সাফল্য রচনায়। কৌশলী সকল কর্মকাণ্ডের সমন্বিত ফলাফলে ফরাসি রাজকন্যা ইংলিশ রাজবধূ হয়ে উঠলেন ইংরেজ সিংহাসনের ক্ষমতাসীন রানি আর ফরাসি সেনাপতি রজার মোল্টিমা মূল ক্ষমতার উৎস অঘোষিত রাজা। আর যিনি রাজা হবার কথা, রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড, তিনি তখনো নাবালক! জনমতসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পরিকল্পিত ব্যবহারে দিশা সৃষ্টির এ রকম অজস্র উদাহরণ আমরা দেখতে পাই ইতিহাসের পরতে পরতে।

আজকের দিনে দিশা সৃষ্টির অসামান্য সুযোগ সমাজে বাসকারী প্রতিটি মানুষই কাগজে-কলমে সমানভাবে ধারণ করেন। সামাজিক বিকাশ আজ উত্তর-আধুনিকতার শীর্ষ স্তরে বিকশিত। গণতান্ত্রিক বিকাশের অন্যতম সুফল ব্যক্তিস্বাধীনতা। গণতান্ত্রিক পরিবেশে প্রতিটি ব্যক্তির সুযোগ রয়েছে নিজস্ব বক্তব্য অপরের নিকট তুলে ধরার। নিজস্ব মতের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার প্রয়াস রচনায়, নেতৃত্ব প্রদানে অগ্রসর হতে পারেন সমাজের প্রতিজন। ধারাবাহিক বিকাশের এটি বিশাল অর্জন। মূলত, জনমত হচ্ছে সমাজের কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে লালনকৃত চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। বৃহত্তর দৃষ্টিকোণে, জনমত হচ্ছে আকর্ষণী ক্ষমতাযুক্ত বিশেষ গতিশীল মত উপাদান, যার মাধ্যমে সমাজের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ধারণকৃত চিন্তার প্রতি বৃহত্তর অংশকে প্রভাবিত করার সক্ষমতা রচিত হয়।

কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়নকালে করণীয় কাজটি নতুনভাবে করা কিংবা নতুন ধারণা অথবা উদাহরণ দিয়ে আলোচনা হয় অজস্র। বিশেষ করে উঠতি বয়সের নবীন কর্মীরা সব সময়ই আরো নিখুঁতভাবে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে গিয়ে নতুন কৌশলের প্রতি তাঁদের আগ্রহ দেখিয়ে থাকেন। আলোচনার টেবিলে এসব নবীন ভাবনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নতুনত্বপূর্ণ, গঠনমূলক ও লোভনীয়। এই যে নতুনত্বপূর্ণ, গঠনমূলক এবং লোভনীয় আলোচিত কৌশল বা নতুন কিছু করার ধারণা, এটিই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ভাবনা। গবেষণায় দেখা যায়, সমাজ বিনির্মাণে বৃহৎ গোষ্ঠীর ভাবনা সচরাচর পুরাতন ধ্যানধারণাপ্রবণই হয়ে থাকে এবং সমাজের অধিকাংশের

লালিত জনমত হচ্ছে প্রতিক্রিয়ামুখী একটি ধীর প্রক্রিয়া, যা নতুন ধারণাকে সহজে আত্মীকরণে অনভ্যস্ত।

আব্রাহাম লিঙ্কন ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর ডেমোক্রেটিক-দলীয় প্রতিপক্ষ প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী স্টেফিন ডগলাসের সাথে ইলিনয়েসে এক বিতর্কে বলেছিলেন, 'Public sentiment is everything. With public sentiment nothing can fail. Without it nothing can succeed. পাবলিক সেন্টিমেন্টের দুষ্টু ব্যবহার দিয়ে পৃথিবীতে অজস্র যুদ্ধ যেমন সংগঠিত হয়েছে আবার একই সাথে এর নিপুণ ব্যবহারে অজস্র জাতি স্বীয় উন্নতির শিখরেও আসন লাভ করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর জার্মান জাতিকে উন্নতির পথে ধাবিত করেছে পাবলিক সেন্টিমেন্টের সুনিপুণ ব্যবহার। আবার একই সাথে পাবলিক সেন্টিমেন্টের মাধ্যমেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা! ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবোধ লালন এবং মননে এ দেশের প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভূমিকা অবশ্যই প্রশংসনীয়। মহান স্বাধীনতাযুদ্ধকালে দেশের সকল জনগোষ্ঠীর মাঝে যুদ্ধপরিবেষ্টিত অবস্থায়ও স্বাধীনতাবোধ তীব্রকরণে এবং এই বিষয়ে পাবলিক কনসেন্ট বা জনমত বিনির্মাণে পরিবেশগত আনুকূল্যের কারণে বেতার মাধ্যম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।

১৯৩২ সাল, আলবার্ট আইনস্টাইন তখন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং শিক্ষক। একদিন সিনিয়র ক্লাসে ফাইনাল টেস্টে শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রশ্ন বিতরণ করছিলেন। পরীক্ষার হলে আইনস্টাইনের প্রশ্নপত্র দেখে বিস্মিত হন তাঁর সহকারী। অবাক হয়ে দেখেন, আইনস্টাইন গত বছরের প্রশ্নপত্রটিই হুবহু নতুন প্রিন্ট করে বিতরণ করছেন। সহকারী তড়িঘড়ি করে আইনস্টাইনের কাছে ছুটে যান এবং প্রশ্ন করেন, মিস্টার আলবার্ট আইনস্টাইন, আপনি কি গত বছরের ব্যবহৃত একই প্রশ্নপত্র শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করছেন না? এইটি কি ঠিক হচ্ছে? আইনস্টাইন দ্বিগুণ পরিমাণ অবাক হলেন। তিনি গম্ভীরভাবে তাঁর সহকারীকে বললেন, দেখো, প্রশ্নগুলো গত বছরের হলেও উত্তরগুলো বদলে গেছে! আইনস্টাইনের এই বদলে যাওয়া উত্তরের বিষয়টিকে মাথায় নিয়েই ভাবছি, ১৯০১ সালে যদি কোনো বিদগ্ধ পাঠককে প্রশ্ন করা হতো, আচ্ছা, জনমত বিনির্মাণ-সহায়ক মিডিয়া বলতে কী বোঝায়? নিশ্চিতভাবেই, উত্তরে বলতেন সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক পত্রিকা ইত্যাদি। একই প্রশ্ন যদি ১৯২৭ সালে করা হয়? উত্তরে নিশ্চয়ই সংবাদপত্রের সাথে বেতার শব্দটিও যুক্ত হতো। প্রশ্নটি ১৯৩৬ সালে করা হলে পূর্বের উত্তরের সাথে যুক্ত হতো টেলিভিশন। আজকে ২০১৮

খ্রিষ্টাব্দে এসে একই প্রশ্নের উত্তরে আমরা কী বলব? মিডিয়া কনভার্জেন্সের কল্যাণে আজকে প্রচলিত এবং নতুন মিডিয়া সব মিলেমিশে মিডিয়ার সংজ্ঞায় নতুন উত্তর যুক্ত হয়েছে। মূলত মিডিয়ার সংজ্ঞা নির্ধারণে আমাদের বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন, প্রশ্নগুলো একই আছে, উত্তরগুলোই বদলে গেছে! আর এই বদলে যাওয়া উত্তরগুলো যদি আমরা আমাদের অনুকূলে লিখতে চাই, সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন সমসাময়িক মিডিয়ার ভূমিকা নির্ধারণে সমাজের চাহিদা এবং অংশীজনদের ভাবনাগুলোকে জনস্বার্থে অনুকূলে রূপান্তরের প্রয়াস রচনার বিষয়টিকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া। একটি দেশের গণমাধ্যম, দেশের জনগোষ্ঠীর কল্যাণে, সামাজিক উন্নয়ন ইস্যুতে জনমত বিনির্মাণে কাজ করে থাকে। গবেষণালব্ধ ফলাফলের ব্যাপক প্রয়োগের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সক্ষমতা। প্রয়োজন পেশাগত দক্ষতায় একই প্রাতিষ্ঠানিক বলয়ে সকল মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনাকরণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর উষালগ্ন। ব্রিটেনজুড়ে শিল্পায়নের বিকাশে সমাজে নব্য শ্রমিকশ্রেণির বিকাশ ঘটছে। কৃষিকাজের তুলনায় পেশাজীবী কাজে অনেক বেশি পারিশ্রমিক আর শ্রমের পরিমাণও তুলনামূলক কম। জীবনকে উপভোগের সুযোগ আর স্বাধীনতাও বেশি। এমনি পরিস্থিতিতে ১৯২২ সালের ১৮ অক্টোবর ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানির যাত্রা শুরু। প্রতিষ্ঠানটি ১৪ নভেম্বর লন্ডনের মার্কনি হাউস (2LO) থেকে প্রথম অনুষ্ঠান প্রচার করে। কোম্পানির প্রথম জেনারেল ম্যানেজার জন রিথ বিশ্বাস করতেন, শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজের উদীয়মান শ্রমিকশ্রেণির প্রভাবে পরিবর্তিত সামাজিক গণসংস্কৃতির ধারাকে অবজ্ঞা বা ভয় পাবার কিছু নেই, বরং প্রয়োজন এটিকে সমাজের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য সঠিক পথে পরিচালিত করা। প্রয়োজন মূল্যবোধের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। জন রিথ ব্রডকাস্টিংয়ের মাধ্যমে সামাজিক সুষম বিকাশের সুযোগ দেখতে পান। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, রেডিও সেট থেকে লব্ধ আয়ের অপ্রতুলতার কারণে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রচণ্ড অর্থসংকটের মুখে পড়েন এবং পরবর্তী সময়ে বাধ্য হয়ে দেউলিয়া ঘোষিত হন। জন চার্লস ওয়ালসএম রিথ সংক্ষেপে জন রিথের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পরবর্তী সময়ে ১৯২৭ সালের ১ জানুয়ারি ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (বিবিসি) নামে রাজকীয় সনদের মাধ্যমে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে ব্রিটেনের প্রথম সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান।

বিবিসির প্রথম ডিরেক্টর জেনারেল জন রিথ। মূলত, দেশের গণসংস্কৃতির উন্নয়নে, দেশের আপামর জনসাধারণকে সামাজিক, রাজনৈতিকসহ সকল অঙ্গনের বহুবিধ

তথ্য প্রদান এবং একই সাথে বিনোদন প্রদানের পাশাপাশি সামাজিক বিভিন্ন দ্বন্দ্বমূলক বিষয়ে জনগণকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে শ্রোতার নিকট প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরার মাধ্যমে শক্তিশালী গণসংস্কৃতির ভিত্তি বিনির্মাণে সম্প্রচারের সম্ভাবনার বিষয়টি প্রথম উপলব্ধি করেন জন রিথ। মূলত সম্প্রচারের মাধ্যমেই ব্রিটিশ আর্ট গ্যালারি থেকে শুরু করে ওয়েস্ট মিনস্টারসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের সকল বার্তা নিমেষেই ভোক্তার লিভিংরুমে উপস্থাপনের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়। জন রিথ মনে করেন, গণসংস্কৃতির বিকাশে সম্প্রচার কার্যক্রম ডিমান্ড ফলোইং না হয়ে বরং এটি হবে সাপ্লাই লিডিং। রাষ্ট্রীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য সমাজের উচ্চশ্রেণির মূল্যবোধের সাথে সমন্বয় এবং নব্য উদীয়মান শ্রমিকশ্রেণির চিন্তা, সামাজিক রুচি ও মূল্যবোধের সঠিক বিকাশে সম্প্রচার হবে ইকোয়েলাইজিং ফোর্স। ইতিবাচক জনমত বিনির্মাণে সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান সমাজে নতুন ধ্যানধারণা এবং উদ্ভাবনী বিষয়সমূহ সম্পর্কে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। শ্রোতার প্রতিদিনকার পরিচিত বিষয়বস্তুর বাইরে গিয়ে শিল্পকলা, দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞানের উদ্ভাবনী বিষয় সম্পর্কে মানুষকে আকৃষ্ট করবে। রিথ মনে করেন, একজন নব্য বিকাশমান ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠান সব সময় জানে না, নিজস্ব বিকাশ ত্বরান্বিত করণে কী প্রয়োজন! প্রয়োজনের বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধির জন্য সেবার উপস্থিতি সম্পর্কে পূর্বধারণা থাকাও অত্যাবশ্যক। সুতরাং গণরুচিবোধ বিনির্মাণে নেতৃত্ব প্রদানই সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করতেন জন রিথ। আর এ কারণেই পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবিসির কার্যক্রমকে জন রিথ প্রকাশ করেন তিনটি মাত্র শব্দে দিয়ে। তিনি মনে করেন, জনস্বার্থকে বিবেচনায় রেখে 'তথ্য, শিক্ষা ও বিনোদন'–এই তিনটি শব্দের মাঝেই নিহিত আছে পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টিং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। জন রিথের বক্তব্য হচ্ছে, সমাজের যা কিছু ভালো, তার জনপ্রিয়করণ এবং যা কিছু জনপ্রিয়, তার মাঝে ভালোর বিকাশ ঘটানোর লক্ষে জনমত প্রতিষ্ঠায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টিং প্রতিষ্ঠানের প্রধানতম দায়িত্ব।

যুক্তরাজ্য থেকে শুরু করে বাংলাদেশ কিংবা যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে দূর প্রাচ্যের ইন্দোনেশিয়া সকলের কাছেই জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করণে পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টিং একটি বহুল চর্চিত বিষয়। স্মিথের (২০১২) মতে, পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টিং ব্যবস্থায় যখন অর্থায়নের স্বাধীনতা, সম্পাদকীয় স্বাধীনতা, অনুষ্ঠান নির্মাণের বৈচিত্র্য, কার্যক্রমের জবাবদিহি, স্বচ্ছতা নিশ্চিতসহ তথ্যসূত্রের একাধিকত্ব নিশ্চিত করা যায়, তখন পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টিং গণতান্ত্রিক

সমাজব্যবস্থার বিকাশ ও পরিপক্বতায় ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে কাজ করে থাকে। স্লাভকো স্পিচালের (২০০৭) মতে, সংবাদপত্র তার পাঠকদের কখনই গল্পের তাৎক্ষণিক সাক্ষী বানাতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে স্পিচালের বক্তব্য হচ্ছে, সংবাদপত্রে কোনো ঘটনার বর্ণনায় সাধারণত, প্রয়োজনীয় অংশে বোদ্ধা মতামত নেওয়া হয়, যেখানে প্রাসঙ্গিক অঙ্গনের সেলিব্রিটিগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু গল্পের উপস্থাপনায়, গল্পের আকর্ষণীয় করণে সাধারণ শ্রোতা-দর্শকদের অংশগ্রহণ নিয়ে তাৎক্ষণিক প্রচারযোগ্য কার্যক্রম শুরু করে প্রথমত রেডিও এবং পরবর্তী সময়ে টেলিভিশন। সাধারণ ভোক্তার সরাসরি অংশগ্রহণ কৌশলের নিপুণ প্রয়োগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপস্থাপক, অভিনয়শিল্পী এবং প্রযোজকগণ ব্যাপক জনপ্রিয়তা ইতিপূর্বে অর্জন করেছেন এবং আজও করছেন। এর ফলে এ ধরনের অনুষ্ঠান সর্বজনীন দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। কৌশলী উপস্থাপনার এই ধরনের অনুষ্ঠান নাগরিক যোগাযোগ এবং মত বিনির্মাণে সহায়ক। সাধারণ শ্রোতার অংশগ্রহণে এমনই একটি বেতার অনুষ্ঠান 'ডেজার্ট আইল্যান্ড ডিস্ক'। অনুষ্ঠানটি ১৯৪২ সালে বিবিসি রেডিওতে শুরু হলেও বিবিসি রেডিও ফোরে আজও টিকে আছে ভোক্তার সরব অংশগ্রহণের মাধ্যমে। টেলিভিশনের ক্ষেত্রে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন প্রযোজিত 'বাংলাদেশ সংলাপ' হতে পারে এমনই একটি উদাহরণ।

বর্তমান যুগে আমরা প্রায়শই শুনতে পাই 'ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী' কিংবা 'বিশ্ব আজ হাতের মুঠোয়'। পৃথিবী আজ যতটা ছোট হয়েছে, ঠিক ততটাই বিকশিতও হয়েছে। পৃথিবীর দৃশ্যমান সীমারেখা আজ অজস্র গুণে সম্প্রসারিত। অতীতে একজন নেতা অনেক বেশি খোলামেলাভাবে তাঁর অনুসারীদের সাথে চলাফেরা করতেন এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতেন। নিরাপত্তার বিষয়টি ছিল অপেক্ষাকৃত কম বিবেচ্য। আজকের সমাজে পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে, দেশের নাগরিক এবং অনুসারীরা তাঁদের নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে অতীতের তুলনায় এখন অনেক বেশি জানেন এবং তাঁদের কর্মকাণ্ডের সাথে অনেক বেশি পরিচিত থাকেন। এটি সম্ভব হয়েছে, আধুনিক মিডিয়ার অসাধারণ বিকাশের কারণে। মিডিয়ার কৌশলী সহায়তায় একজন নেতা আজ যেকোনো সময়ের তুলনায় অধিক ক্ষমতাশালী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পাচ্ছেন। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অব্যাহত বিকাশমান এই মিডিয়ার আশ্রয়ে আজকের দিনের একজন নেতা তাঁর অনুসারীদের নিকট নিজস্ব বক্তব্য এবং সম্পর্ক স্থাপনে সকল ভৌগোলিক দূরত্ব এবং সামাজিক শ্রেণিভেদকে অতিক্রম করেন নিমেষেই।

জনমত বিনির্মাণ অথবা বলা যেতে পারে গণজাগরণ সৃষ্টিকরণ বিষয়টির ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুই ধরনের প্রয়োগই সমাজে ঘটতে পারে।

ইতিবাচক প্রয়োগই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়। সরকারি কর্তৃত্ববাদ এবং রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে গণমানুষের কল্যাণে উন্নয়ন ইস্যুতে জনমতের কৌশলী বিনির্মাণ মানবসভ্যতায় যুগ যুগ ধরেই স্বীকৃত একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। আমাদের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিটি নাগরিক এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মতামত প্রকাশ বা বাক স্বাধীনতার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। একটি সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান জনমানুষের কল্যাণে কোনো একটি বিষয়ে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে নিজস্ব মতের অনুসারীকরণে চেষ্টা করতেই পারে। মত বিনির্মাণে আলোচ্য বিষয় নিয়ে শ্রোতা-দর্শকদের কাছে যাওয়া, যৌক্তিক বহুবিধ বিশ্লেষণে সমাধানের বিকল্প ধারণাসমূহ উপস্থাপন, অনুকূলে-প্রতিকূলে বক্তব্য উপস্থাপন, স্বাধীন মত উপস্থাপন, প্রিন্ট মিডিয়ায় বিশ্লেষণী মতামত পর্যালোচনা, বেতার-টেলিভিশনে আবেগজড়িত হৃদয়স্পর্শী প্রতিবেদন সম্প্রচার–এসবই আমাদের সংবিধানের লালিত স্বীকৃতি।

বিভিন্ন গোষ্ঠী, দল বা জনসাধারণের বিভিন্ন ইস্যুতে রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে জনপ্রতিনিধিরা নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। জনস্বার্থ সংরক্ষণে একজন জনপ্রতিনিধি অপর প্রতিপক্ষ নেতা বা দলের সাথে তুমুল শব্দযুদ্ধে লিপ্ত হন। এডওয়ার্ড বার্নেসের মতে, 'একজন জননেতা মিডিয়া জগতের পেশাদারি বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় উদ্দেশ্যমূলক ও বৈজ্ঞানিকভাবে তাঁর অনুসারীদের মাঝে নিজ মতবাদের সমর্থনে জনমত সৃষ্টি করতে পারেন।' বার্নেসের মতে, এটি হচ্ছে জনমতের কৌশলী বিনির্মাণ বা 'দ্য ইঞ্জিনিয়ারিং অব কনসেন্ট'। এ প্রসঙ্গে বার্নেস আরো বলেন, একটি রাজনৈতিক দল বা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে শেষ পর্যন্ত গণ-অনুমোদনের ওপরই নির্ভর করতে হয়। অধিকাংশ মানুষ যখন হ্যাঁ বলেন এবং কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে গণজোয়ার সৃষ্টি সম্ভবপর হয়, তখন কাজটি এগিয়ে নেওয়া সহজতর হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে বার্নেস জোর দিয়ে বলেন, 'শেষ পর্যন্ত সকলকেই জনগণের মতামত বিনির্মাণসংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলা করেই নিজস্ব প্রকল্প বা লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যেতে হয়।' মূলত, মত বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায়, কার্যক্রমের অভীষ্ট লক্ষ্য পূর্ব থেকেই সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করে নিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৭ সালের নভেম্বর মাস। উত্তর কোরিয়াতে ব্যাপক বৃষ্টি আর বন্যার কারণে হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের এই মর্মান্তিক প্রাণহানিতে বিশ্বমিডিয়া সরব হয়ে উঠেছে। এদিকে রাষ্ট্রপতি কিম জং-উন পশ্চিমের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে একের পর এক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েই যাচ্ছে। এ অবস্থায় বন্যায় আক্রান্তদের জন্য পশ্চিমের আমজনতার মাঝে মানবিক বোধ সৃষ্টি এবং সাহায্য আদায় এক অসম্ভব প্রয়াস! তথাপি,

মানবিক সাহায্যার্থে তহবিল সংগ্রহের জন্য যদি কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ও, সে ক্ষেত্রে তহবিল সংগ্রহের সময়সীমা এবং কত টাকা সংগ্রহ করা হবে, তার সর্বোচ্চ সীমা পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই তহবিল সংগ্রহ কার্যক্রমে বৃহত্তর সারা সৃষ্টি এবং সফল করার জন্য কোনো সাধারণ ভৌগোলিক এলাকা, যেমন: ইউরোপ/এশিয়া টার্গেট না করে বরং নির্দিষ্ট দেশ বা আরো সুনির্দিষ্ট স্থানের টার্গেট করে কাজ করলে লক্ষ্য অর্জন অনেকটা সহজতর হয়।

জনমত বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায়, অভীষ্ট গোষ্ঠীর উপযোগী ভাষায় মিডিয়ার সহায়তায় উদ্দেশ্যমূলক বার্তা হেবারমাস (১৯৯২) প্রস্তাবিত কাঙ্ক্ষিত বলয় (পাবলিক স্ফেয়ারে) ছড়িয়ে দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে বিনির্মাণ বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য উপস্থাপন এবং শব্দ চয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর আচরণ পরিবর্তনে যেসব উপকরণ একজন বিনির্মাণ বিশেষজ্ঞ ব্যবহার করবেন, তাঁদের কার্যকারিতা সম্পর্কে পূর্ব থেকেই ষোলো আনা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। সহজ, বোধগম্য এবং প্রাঞ্জল শব্দের ব্যবহার বক্তব্য উপস্থাপনে বাঞ্ছনীয়। প্রতিটি বাক্যে শব্দসংখ্যা ১৬ থেকে ১৮-এর মধ্যে থাকলে বক্তব্য সহজপাঠ্য হয়ে ওঠে। আচরণগত পরিবর্তন সাধনে একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হচ্ছে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে আকর্ষণ সৃষ্টিকারী চটকদার গল্প পরিবেশন। বিনির্মাণ বিশেষজ্ঞ আগ্রহোদ্দীপক গল্প উপস্থাপন করে কৌশলে কাঙ্ক্ষিত বক্তব্যটি লক্ষ্য দলের মাঝে ছড়িয়ে দেন। লক্ষ্যদল নিজেদের অজান্তে গল্পটি সম্পর্কে জানেন, বিমোহিত হন এবং আচরণগত পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় নিজেদের শামিল করেন। মিডিয়া জগতে তথ্য সব সময়ই একটি অজড় উপাদান। এর মাঝে গতিশীল মাত্রা যেমন থাকে, তেমনি নিহিত থাকে নির্ভরশীল তথ্যসূত্র। প্রতি মুহূর্তে জন থেকে জনে বিস্তারে সক্ষম তথ্যসংবলিত বক্তব্য কার্যকরভাবে পরিবেশিত হলে সংশ্লিষ্ট জনদের মাঝে ভাবনা ও চিন্তনের বীজ বপিত হয়। এই প্রসঙ্গে পাবলিক রিলেশনসের জনক এডওয়ার্ড বার্নেস (১৯২৮) বলেছেন, 'যেখানে বহু লোকের সংশ্লিষ্টতা বিরাজমান, এমন সংবাদ সৃষ্টি করার মতো ঘটনা সাধারণত দৈবাৎ ঘটে না। এ সকল ঘটনা উদ্দেশ্যমূলক এবং পরিকল্পিতভাবেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণে করা হয়ে থাকে।' জনমত বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের চিন্তা এবং কর্মকে প্রভাবিত করার প্রয়াস রচনা করা হয়। সামাজিক বিকাশে কৌশলী জনমত বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার জন্য সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে স্পর্শ করার মূল চাবি হচ্ছে সামষ্টিক মিডিয়া। জনমত বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় মিডিয়া আউটলেটসমূহের বিচ্ছিন্ন প্রয়াস তুলনামূলকভাবে কম কার্যকর।

গল্পটি ১৯৩০-এর দশকের। উঠতি অর্থনীতির দেশ আমেরিকার তামাকশিল্প নিজেদের ভিত রচনায় সংগ্রামরত। মার্কিনমুলুকে সিগারেট ব্যবসাকে আরো ঝাঁকিয়ে বসানোর জন্য চলছে নানা কসরত। রকমারি বিজ্ঞাপন আর চটকদার বাণী দিয়ে চলছে তুমুল লঙ্কাকাণ্ড। কিন্তু কিছুতেই যেন কিছু হচ্ছে না। মার্কেট রিটার্নেও ঘটছে না ঊর্ধ্বমুখী তেমন আস্ফালন। সমাজে ধূমপান বিষয়টিরও নেই সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা। মেয়েরা তো একেবারেই না। গল্পের এমন ক্লাইমেক্সে মঞ্চে আগমন করেন মার্কিন তামাক ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি জর্জ ওয়াশিংটন হিল। হিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি তাঁর ব্যবসাকে রাতারাতি দ্বিগুণ করবার জন্য খুঁজছেন একজন জাদুকর। জাদুর পরশে ধূমপান বিষয়ে সমাজের নেতিবাচক ধারণাগুলোকে রাতের আঁধারে পাল্টে দেবেন জাদুকর। দিনের আলোতে মুখে মুখে রটবে ধূমপানের অজস্র গল্পকথা। মূলত হিল চাইছেন ধূমপানসম্পর্কিত সমাজের প্রচলিত ধারণার আমূল পরিবর্তন। সমাজে ধূমপানবান্ধব একটি নতুন মত প্রতিষ্ঠা করতে আজ তিনি মরিয়া। এর মধ্যেই নিহিত আছে তাঁর আর্থিক ভবিষ্যৎ। গল্পের এই পর্যায়ে পর্দায় আবির্ভাব করলেন এডওয়ার্ড বার্নেস। আমেরিকার সেই সময়কার তারকাখ্যাতির ব্যক্তিত্ব।

জর্জ ওয়াশিংটন হিলের প্রস্তাবে বার্নেস জানতে চাইলেন, এই কাজে তোমার বাজেট কত?

কত লাগবে? জানতে চাইলেন হিল।

বিরক্ত হয়ে বার্নেস বললেন, আমায় বিরক্ত কোরো না! আমি ব্যস্ত আছি।

খুব অবাক হলেন হিল। বললেন, 'আমি জানি তুমি ব্যস্ত! কিন্তু কাজটা আমার করতেই হবে। আর তাই তো তোমার কাছে আসা। টাকা যতই লাগুক না কেন!'

এবার বার্নেসের চোখের কোণে হাসি ফুটল! বললেন, 'তার মানে তুমি বলতে চাইছ, এই কাজে তোমার বাজেট সীমাহীন! কিন্তু ফলাফল অবশ্যই চাই!'

জর্জ ওয়াশিংটন হিল সম্মতি দিয়ে মাথা নাড়লেন এবং প্রসন্ন মুখে রাজি হলেন।

আচ্ছা দেখি, তোমার জন্য কী করতে পারি! খুশি মুখে প্রত্যুত্তরে বললেন বার্নেস।

এরপর বার্নেস একজন সমাজ মনোবিজ্ঞানীর দ্বারস্থ হলেন। জানতে চাইলেন, ধূমপান বিষয়ে সমাজে নারীদের মাঝে যে বিরূপ মনোভাব রয়েছে, তার কারণ কী? কেন এই অনীহা? টাকা যা লাগে দেওয়া হবে। বিনিময়ে উত্তরটি হতে হবে ষোলো আনা যথার্থ।

সমাজ মনোবিজ্ঞানী এ এ ব্রিল সময় নিয়ে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে জানালেন, আমেরিকান নারীদের কাছে সিগারেট হচ্ছে, এটি পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার প্রতীক। সামাজিক বৈষম্যের কারণে নারীরা পুরুষের ব্যবহৃত সিগারেটের মধ্যে নিজস্ব বঞ্চনার ইঙ্গিত পান। তাই সিগারেটের প্রতি তাঁদের নিজস্ব বিতৃষ্ণা কাজ করে এবং নিজস্ব সুরক্ষায় তাঁরা এই প্রবণতা থেকে দূরে থাকেন।

আচ্ছা, তাই নাকি? তুমি কি নিশ্চিত? এইটিই প্রকৃত কারণ? জানতে চাইলেন বার্নেস।

আমি আমার গবেষণায় ভুল করি না! বললেন, আত্মবিশ্বাসী এ এ ব্রিল।

বার্নেস মনোবিজ্ঞানী এ এ ব্রিলের জবাবে সন্তুষ্ট হয়ে এবার তাঁর পরবর্তী পরিকল্পনায় নেমে গেলেন। সামনেই নিউইয়র্কে ইস্টার সানডের প্যারেড। বার্নেস দিনটিকে টার্গেট ধরে এগিয়ে গেলেন নিজস্ব কর্মসূচি বাস্তবায়নে। পরিকল্পনামাফিক নির্দিষ্ট দিনে ইস্টার সানডের প্যারেড শুরু হতে চলেছে। জাতীয় স্টেডিয়ামজুড়ে অসংখ্য জনতার আনাগোনা চলছে। পুরো স্টেডিয়াম বলতে গেলে কানায় কানায় পূর্ণ। এমনি পরিস্থিতিতে অসংখ্য জনতাকে তাক করে দিয়ে কয়েকজন নারী সেলিব্রিটি নিজেদের পোশাকের অবয়ব থেকে সিগারেট বের করলেন এবং জনসমক্ষে প্রজ্বলিত সিগারেটে সুখ টান দিতে লাগলেন। বিষয়টা অনেকটাই যেন নিজস্ব আড্ডায় মশগুল কিছু স্বাবলম্বী নারীর তীব্র আত্মবিশ্বাসের প্রকাশ। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সকল মানুষ অবাক হয়ে দেখছেন অবাক করা গল্পের মঞ্চায়ন। বার্নেস এখানেই থামলেন না। নিজস্ব কৌশলে প্যারেড প্রাঙ্গণে উপস্থিত সকল সংবাদকর্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঘটনাস্থলে ছুটে আসা সংবাদকর্মী এবং ফটোগ্রাফারদের মাঝে বার্নেস বিতরণ করলেন নিজস্ব প্রেস রিলিজ, যার শিরোনাম হলো, 'টর্চেস অব ফ্রিডম'। বার্নেসের প্রচারণার মূল বক্তব্য হচ্ছে, 'সিগারেট নারী স্বাধীনতার প্রতীক, নারীর নিজস্ব টর্চ।' পরবর্তী দিন পত্রিকার প্রথম পাতায় টর্চেস অব ফ্রিডম বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়। 'নিউইয়র্ক টাইমস' এর মধ্যে অন্যতম। দেশজুড়ে মানুষ জানল সিগারেট হলো টর্চেস অব ফ্রিডম। প্রকাশিত সংবাদের ভাষ্যকে দেশজুড়ে আরো তীব্র করণে এরপর প্রিন্ট ও রেডিও মিডিয়াতে প্রচারিত হলো অজস্র বিজ্ঞাপন। টর্চেস অব ফ্রিডম ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় আমেরিকাজুড়ে। এই জনপ্রিয়তা আজও প্রতিষ্ঠিত। আমেরিকাজুড়ে সিগারেট ব্যবসা রমরমা হারে বাড়তে লাগল। নিজের ব্যবসায়িক সাফল্যে আত্মহারা জর্জ ওয়াশিংটন হিল অত্যন্ত কৃতজ্ঞ চিত্তে বার্নেসকে ধন্যবাদ জানালেন। মিডিয়ার কৌশলী ব্যবহারে ধূমপানের মতো একটি অস্বাস্থ্যকর সামাজিকভাবে প্রত্যাখ্যাত বিষয়ে জনমতের আমূল পরিবর্তন ঘটালেন বার্নেস। কৌশলী এই প্রচারণা

কার্যক্রম এত বছর পর আজও মিডিয়াবিশেষজ্ঞদের একাডেমিক আলোচনার বিষয়।

সামষ্টিক জনমত বিনির্মাণে প্রিন্ট, অডিও এবং ভিডিও এককভাবে খুব কমই করতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা কৌশলী কর্মপরিকল্পনার পরিকল্পিত অংশীজন হয়ে গবেষণালব্ধ প্রক্রিয়ায় সমন্বিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে। মূলত পরিকল্পনাটি যদি সঠিকভাবে করা হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয়ত, পর্যাপ্ত বাজেট সহায়তায় মিডিয়া আউটলেটগুলোর সার্থক ব্যবহার যদি করা যায়, তবে জনমত বিনির্মাণ কার্যক্রম সফল হতে বাধ্য। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বার্নেসের মতে, 'যে ধারণা অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে বিতরণ করা হয়, তা লক্ষ্যদলের প্রাত্যহিক জীবনের অনুষঙ্গে পরিণত হয়।' মূলত মানুষ যখন কোনো নতুন ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়, বিষয়টি দ্বারা কনভিন্স হয়, তখন লব্ধ ধারণাটি তার চিন্তনে প্রভাব ফেলে এবং পরবর্তী সময়ে ব্যক্তিগত আচরণে তা প্রকাশিত হয়। আদর্শগত, রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা নির্বাচনী যুদ্ধ সকল ক্ষেত্রেই জনমত বিনির্মাণের প্রয়োগ ইতিহাসে ঘটানো হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই প্রয়োগ অব্যাহত থাকবে বলেই ধারণা পোষণ করি। কিন্তু বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, এই প্রয়োগ যুগে যুগে কখনোই দৈবাৎ ঘটেনি।

মত বিনির্মাণবিষয়ক লেখাটি শেষ করবার আগে ২০০৭ সালে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক এবং নিউ মিডিয়ার সমন্বয়ে বিবিসি কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রচারণা কার্যক্রম সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা করব। ভারতে এইডস রোগীর সংখ্যা এবং বিস্তারের সম্ভাবনা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। ২০০৬ সালের হিসাবমতে, আনুমানিক ২৫ লাখ লোক ভারতে এইডস দ্বারা আক্রান্ত। ভারতের জাতীয় এইডস নিয়ন্ত্রণ সংস্থার হিসাবমতে, আক্রান্তদের ৮৩ শতাংশের এইডসের বিস্তার ঘটেছে অনিরাপদ যৌন মিলন দ্বারা। বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের গবেষণা অনুযায়ী মাত্র ৭ শতাংশ ভারতীয় সেক্স বিষয়ে উন্মুক্ত পরিবেশে খোলামেলা আলোচনা করে থাকেন। এ অবস্থায় দেশব্যাপী এইডসের বিস্তার কমিয়ে আনতে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিকরণ জরুরি একটি বিষয়। বিষয়টি নিয়ে প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে এগিয়ে আসে তৎকালীন বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস ট্রাস্ট, যা বর্তমানে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন নামে পরিচিত। বিবিসির প্রচারণার উদ্দেশ্য, নিরাপদ সেক্স বিষয়ে ভারতীয়দের আচরণগত পরিবর্তন সাধন এবং এর মাধ্যমে এইডসের প্রকোপ কমিয়ে আনা। মূলত বিল অ্যান্ড মিলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়।

প্রচারণা কার্যক্রমে জনগণের আকর্ষণ টানতে একটি সবজান্তা টিয়া পাখি, একজন কৌশলী কাবাডি খেলোয়াড়, কনডম-বিষয়ক রিংটোন এবং সবশেষে কনডম নামের একটি কুকুরছানা শ্রোতা-দর্শকের সামনে উপস্থাপন করা হয়। পুরো প্রচারণার সময়জুড়ে ধাপে ধাপে চরিত্রগুলো জনসমক্ষে উপস্থাপন করা হয়। ২০০৭ সালের ১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবসকে টার্গেট করে বেতার এবং টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন আকারে একটি ঘোষণা প্রচার করা হয়। এতে একটি উন্মুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কুইজের উত্তর হচ্ছে 'কনডম'। বিজ্ঞাপনের শুরুতে বলা হয়,

এটি পৌরুষের প্রতীক তবে গোঁফ নয়
সুরক্ষার প্রতীক তবে হেলমেট নয়
ছোট্ট এই বস্তু !
কোনো সন্দেহ নাই।
যে এর সম্বন্ধে আলোচনা না করে, সে যে পুরুষেই নাই!
...কি সেই ছোট্ট জিনিস?

এরপর শ্রোতা-দর্শকদের নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করে উত্তর জানাতে বলা হয়। বিজয়ীকে মোবাইল ফোন এবং ক্যামেরা প্রদানের ঘোষণা দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনটি বেতার, টিভি ছাড়াও দৈনিক পত্রিকা এবং বিলবোর্ডের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করা হয়। প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য শ্রোতা-দর্শক যেন কনডম বিষয়টি নিয়ে নিজস্ব গণ্ডিতে আলোচনা করেন। তিন সপ্তাহব্যাপী এই কুইজ প্রতিযোগিতা ভারতের চারটি রাজ্য অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং তামিলনাড়ু জুড়ে করা হয়। চারটি রাজ্যের ১০ কোটি মানুষের নিকট বার্তাটি পৌঁছানোর জন্য সকল ধরনের মিডিয়ার সহায়তা নেওয়া হয়। মূলত এই রাজ্যগুলোতেই ভারতীয় এইডস রোগীদের ৮৩ শতাংশের বসবাস। গবেষণায় দেখা যায়, প্রচারণার পরপরই চার লাখ মানুষ প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করেন। ৮০ শতাংশ লোক বিজ্ঞাপনটি দেখার পর বন্ধু এবং সুহৃদ মহলে এই নিয়ে আলোচনা করেন। অবশেষে সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে ২৫ জন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্বাচিত করা হয় এবং ফ্রি টকটাইমসহ ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল ফোন উপহার দেওয়া হয়।

কনডম নিয়ে লক্ষ্যদলের মাঝে সৃষ্ট আলোচনার আবহ চলমান রাখতে এর পরের ধাপেই ব্যবহার করা হয় ঐতিহ্যবাহী কাবাডি খেলার কৌশল। একজন বুদ্ধিমান খেলোয়াড় দুই পক্ষের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের শেষ ধাপে এসে কাবাডি কাবাডি

বলে ডাক দেওয়ার পরিবর্তে কনডম কনডম বলে ডাক দেয়। বিপক্ষ দল কনডম শব্দ শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং এই সুযোগে কৌশলী কাবাডি খেলোয়াড় নিজ দলকে জয়ী করতে শেষ দান মারেন এবং জয়ী করে তোলেন। বেতার এবং টেলিভিশনে এই কাবাডি ম্যাচ সম্পর্কে প্রচারণা অব্যাহত থাকে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বিষয়টির ওপর বিভিন্ন পত্রিকায় সংবাদ ছাপা হয়। পরবর্তী সময়ে তিনটি দৈনিক পত্রিকাতে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে খেলায় ব্যবহৃত 'কনডম কনডম বলে ডাক দেওয়া' সম্পর্কে পাঠক মতামত জানতে চেয়ে নির্দিষ্ট নম্বরে এসএমএস করতে অনুরোধ জানানো হয়। পত্রিকায় বলা হয়, 'বুদ্ধিমান লোক কনডম সম্পর্কে আলোচনা করে'–যদি এই বাক্যের সাথে একমত হন, তবে ইয়েস লিখে এসএমএস করুন, অন্যথায় নো লিখে এসএমএস করুন। গবেষণায় দেখা যায়, যে সকল পাঠক জবাব দিয়েছেন, তাঁদের ৮৯ শতাংশ প্রচারণার বক্তব্যের সাথে, অর্থাৎ বুদ্ধিমান লোক কনডম সম্পর্কে আলোচনা করেন মর্মে একমত পোষণ করেছেন।

এবার প্রচারণার তৃতীয় ধাপ। কনডম শব্দ নিয়ে অব্যাহত আলোচনাকে ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনে আনবার প্রথম প্রয়াস। বিবিসির গবেষণায় দেখা যায়, ভারত বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল মোবাইল বাজারগুলোর একটি, যেখানে ২০০৭ সালের হিসেবে ৬০ কোটি মোবাইল ব্যবহারকারী রয়েছেন। বিশাল সংখ্যার এই মোবাইল ব্যবহারকারীদের মাঝে কনডম শব্দটিকে প্রাত্যহিক শব্দে পরিণত করার জন্য কনডম শব্দটি দিয়ে একটি রিংটোন তৈরি করা হয়। বিজ্ঞাপন আকারে রিংটোনটি সম্পর্কে বেতার এবং টেলিভিশনে ব্যাপক প্রচার করা হয় এবং লক্ষ্যদলকে জানান দেওয়া হয়। বিবাহোত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে, এক অতিথি অপর অতিথির নতুন মোবাইল ফোন দেখে মুগ্ধ হন এবং নিজ হাতে নিয়ে ফোনের অপশনসমূহ দেখতে থাকেন। এমতাবস্থায় মোবাইলে কল এলে রিংটোন বেজে ওঠে। নতুন মোবাইলে অনভ্যস্ততার কারণে নবীন ব্যবহারকারী মোবাইলের রিংটোন অফ করতে পারছিলেন না। এদিকে বেজে চলা কনডম কনডম রিংটোনের আওয়াজে তিনি ভীষণভাবে অস্বস্তি বোধ করছেন। সংকটজনক এমন নাকাল অবস্থায় অনুষ্ঠানে আসা এক অতিথি রিংটোনটির প্রশংসা করেন। মুহূর্তে পুরো দৃশ্যপটের পরিবর্তন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল অতিথি কনডম রিংটোনের প্রকাশ্য ব্যবহারে ব্যক্তিকে দায়িত্ববান এবং স্মার্ট হিসেবে হাততালি দিয়ে স্বীকৃতি দেন।

মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে রিংটোনটি ডাউনলোডের সুযোগ রাখা হয় এবং একই সাথে পৃথক ওয়েবসাইট চালু করা হয়, যাতে প্রয়োজনে সেখান

থেকেও বিকল্প পথে ডাউনলোড করা যায়। রিং টোনটি ডাউনলোডের জন্য পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এসএমএস অনুরোধ আসে এবং ওয়েব প্ল্যাটফর্মে আরও দুই লক্ষ অনুরোধ আসে সারা পৃথিবী থেকে। বলা হয়ে থাকে, কনডম কনডম রিংটোনটি পৃথিবীর প্রথম ননভার্বাল জনস্বাস্থ্যবিষয়ক যোগাযোগ উপকরণ। রিংটোনটির এই সফলতার পর এটির ওপর ভিত্তি করে 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'সহ বিভিন্ন পত্রিকায় সংবাদ/ফিচার প্রকাশিত হয়। সিএনএন রিংটোনটির ওপর অনুষ্ঠান প্রচার করে। কনডম কনডম রিংটোনটিতে শুধু কনডম শব্দটি বারবার বিভিন্ন সুরে এবং গতিতে তুলে ধরা হয়। এ প্রসঙ্গে রিংটোনটির কম্পোজার রুপার্ট ফার্নান্দেজ এবং বিজয় প্রকাশ বলেন, 'আমাদের সমাজে প্রকাশ্যে কনডম সম্পর্কে আলোচনা করতে আমরা অস্বস্তি বোধ করে থাকি। সুতরাং, আমরা চেয়েছি কনডম–এই একটি শব্দ ব্যবহার করে একটি কনভারসেশন পিস তৈরি করতে, যেটি মানুষ শুনে নিজের আড্ডার জগতে আলোচনা করতে উৎসাহিত হবেন এবং এর ফলে কনডম শব্দ নিয়ে আমাদের যে সামাজিক সীমাবদ্ধতা আছে, তা কিছুটা হলেও কমে আসবে।' তাঁরা আশা করেন, এইভাবে 'কনডম' শব্দটি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে একটি সহজ শব্দে পরিণত হবে।

এবার প্রচারণার শেষ ধাপ। কনডমবিষয়ক চলমান আলোচনা সাইন অফের পালা। এই পর্বেও কনডম নিয়ে আলোচনা চলমান থাকে। তবে এবার কনডম একটি কুকুরছানা। টেলিভিশনে দেখা যায়, এক বয়োজ্যেষ্ঠ নারী একটি কুকুরছানাকে আদর করছেন। আদর করতে করতে তিনি এর মালিকের নিকট নাম জানতে চান? জানতে পারেন, কুকুরছানাটির নাম কনডম! বেশ অবাক হন। তবে পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নেন। জড়িয়ে ধরেন কুকুরছানাটিকে এবং কনডম কনডম বলে আদর করতে থাকেন। এ অবস্থায় একজন ফোড়ন কাটেন, 'ছি! কনডম বলতে একটু লজ্জাও লাগছে না!' বিরক্ত বয়োজ্যেষ্ঠ নারী বলেন, 'চুপ, বেকুব! কনডম শব্দের মাঝে খারাপ কিছু নেই। খারাপ যা আছে, তা মানুষের বোঝার মধ্যেই আছে।' মূলত সর্বশেষ ধাপটিতে, একটি সম্পর্ক দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কনডম শব্দটির অর্থ জানা এবং নিরাপদ জীবন পরিচালনা–এই দুইয়ের সম্পর্কই এখানে মূল বক্তব্য। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই সমগ্র প্রচারণাটি করা হয়েছে, এইডসের বিস্তার কমিয়ে আনবার জন্য। কিন্তু প্রচারণার কোথাও একটিবারের জন্যও এইডস শব্দটি উচ্চারণ করা হয়নি। পুরো প্রচারণা প্রক্রিয়ায় বাজেটের নিশ্চয়তা ছিল শতভাগ।

প্রচারণা কার্যক্রমকে সফল করার জন্য উন্নত কন্টেটের পাশাপাশি বক্তব্য লক্ষ্যদলের সকল অংশে সুষমভাবে ছড়িয়ে দেবার জন্য যেখানে যেটি প্রয়োজন রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকা, মোবাইল ফোন, এসএমএস, ল্যান্ড ফোন, ব্যানার, পোস্টার, লিফলেট, সাইনবোর্ড, প্রণোদনা, নিউ মিডিয়া–সবকিছুই পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক ব্যবহার করা হয়েছে। প্রচারণাকে আরো ইন্টারঅ্যাকটিভ করার জন্য ওয়েবসাইট এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যুক্ত করা হয়েছে। প্রচারণায় সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতিনিধিত্বশীল বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। পূর্বপরিকল্পনার অংশ হিসেবে লক্ষ্যদলের মাঝে নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা চলার জন্য ডিমান্ড সৃষ্টি করা হয়েছে। আলোচনা চলমান রাখার জন্য উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে এবং লক্ষ্যদলকে কনভিন্স করার জন্য মূল উদ্দেশ্য এইডস দমন হলেও পুরো প্রচারণায় একটিবারের জন্যও এইডস শব্দটি উল্লেখ না করে বরং অন্যান্য শব্দের হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপন করে শ্রোতাকে মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট করে কার্যক্রমের সাথে যুক্ত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রোতার মননে আরো দাগ কাটার জন্য প্রচারণায় একটি লোগো, একটি সার্বক্ষণিক স্লোগান এবং নির্দিষ্ট মাসকাট ব্যবহার করা হয়েছে। সবশেষ ধাপে কনডম ব্যবহারকারীকে সামাজিক সফল ও নিরাপদ ব্যক্তিত্ব হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস রচনা করা হয়েছে। কার্যক্রমটির সফলতার কারণে পরবর্তী সময়ে ভারতের জাতীয় এইডস নিয়ন্ত্রণ সংস্থা প্রচারণাটিকে জনস্বার্থে দেশব্যাপী এগিয়ে নিয়ে চলে। গবেষণায় দেখা গেছে, এই প্রচারণার ফলে ২০০৭ থেকে ২০০৯ সালে প্রায় ১৫ কোটি মানুষ এইডস সম্পর্কে জানতে পারে।

এডওয়ার্ড বার্নেস যখন মানুষের আচরণ পরিবর্তন ও জনমত বিনির্মাণে কাজ করছিলেন, তখন তাঁর কাজের ধরনে বাজেটের নিশ্চয়তা ছিল শতভাগ। চিন্তায় ছিলেন যুগের চেয়ে অধিক সৃজনশীল। মিডিয়ার সকল শাখার সফল ব্যবহার ছিল তাঁর কৌশলী অস্ত্র। পরবর্তী সময়ে আশি বছর পর এসে বিবিসি যখন জনমত বিনির্মাণে মাঠে কাজ করছে, তারাও বাজেটের নিশ্চয়তা শতভাগ বজায় রেখেই কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। মিডিয়ার সকল শাখার সমন্বিত ব্যবহারে বিবিসি আরো অধিক উদ্ভাবনী মেধার প্রয়োগ দেখাচ্ছে। কার্যক্রম পরিচালনায় বাজেটের নিশ্চয়তা শতভাগ বলতে এখানে লক্ষ্য অর্জনে বাজেটের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের স্বাধীনতাকে নির্দেশ করা হচ্ছে। এইটি যখন থাকে, তখন জনমতের ইতিবাচক পরিবর্তন কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া নিশ্চিতভাবে সম্ভবপর হয়। আর এই 'সম্ভবপর কার্যক্রম' সমাজ বিনির্মাণে একটি দীর্ঘ মেয়াদি বিনিয়োগ। এটিকে খরচের খাতায় না বসিয়ে বরং বিনিয়োগের হিসাবটা মিলিয়ে দেখা জরুরি। মূলত

সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে সমাজ বদলানোর চেষ্টা করা উচিত নয়, বরং প্রয়োজন সমাজ বদলানোর জন্য সঠিক প্রশ্নগুলো তুলে ধরা এবং বিকল্প উত্তরগুলো খোঁজার জন্য শ্রোতা-দর্শকদের উদ্বুদ্ধ করা। উত্তর যদি সঠিক হয়, সমাজ নিজ থেকেই বদলাতে শুরু করে। এই সহজ কৌশলে জনমত বিনির্মাণ যুগে যুগে দেশে দেশে হয়েছে।

লেখক পরিচিতি : দেওয়ান মোহাম্মদ আহসান হাবীব, উপপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার।

তথ্যসূত্র

Bernays Edward L, The Engineering of Consent, PP:113-120 (Available at: http://www.mcnuttphysics.com/uploads/2/3/6/9/23694535/engineering_of_consent-edward_l_bernays.pdf, date: 18 July 2018).

Bernays Edward L (1928), Manipulating Public Opinion: The why and the how, American Journal of Sociolige, Vol: 33, Issue: 6 (May, 1928), The University of Chicago Press, Chicago, USA (Available at: http://www.rexsresources.com/uploads/6/5/2/1/6521405/bernays-manipulatingpublicopinion.pdf, date: 18 July 2018).

Bill and Melinda Gates Foundation(2011),*Closing the Bridge: Avahan's HIV Prevention Rrograms with Clients of Female Sex Workers in India*, version 1, July 2011, USA, PP 24-25.

British Broadcasting Corporation, History of the BBC, United Kingdom (Available at: https://www.bbc.co.uk/historyofthebbc/research/culture/reith-1, date: 18 July 2018).

BBC Documentary (2002), The Century of the Self - Part 1: "Happiness Machines" written and produced by Adam Curtis, available at: https://www.youtube.com/watch?v=DnPmg0R1M04

BBC Media Action (2013), Condom is Just Another Word, available at: https://www.bbc.co.uk/mediaaction/where-we-work/asia/india/condom-condom and https://www.youtube.com/watch?v=ks1Y7h-JaVY

BBC News (2017), The blackboard Albert Einstein left in Oxford in the 1930s, United Kingdom (Available at: https://www.bbc.com/news/av/uk-england-oxfordshire-41096926/the-blackboard-albert-einstein-left-in-oxford-in-the-1930s)

BBC Radio Four, The History of Desert Island Discs, Available at: http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/59YrnYM0Tw8J7WJ0MGKVfh7/the-history-of-desert-island-discs.

BBC World Service Trust, Annual Review 2009/10, Transforming Lives Through Media, United Kingdom.

BBC World Service Trust, Annual Review 2008/09, Transforming Lives Through Media, United Kingdom.

Constitution of the Peoples' Republic of Bangladesh, Article 39, Government of Bangladesh, Bangladesh. (Available at: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections_all.php?id=367)

Chris Koenig (2012), How Einstein fled from the Nazis to an Oxford college, The Oxford Times, United Kingdom (Available at: http://www.oxfordtimes.co.uk/leisure/history_heritage/9617968.How_Einstein_fled_from_the_Nazis_to_an_Oxford_college/)

Dipak Suryawanshi, Sangram Kishor Patel, Rajatashuvra Adhikary and etal (2016), *Does mass-media public communication campaign normalize discussion, attitude and behavior about condom use among married men in India?,* Journal of AIDS and Clinical Research, School of Health Systems Studies, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, India, Vol-7, Issue-8, July, 2016, PP:7-9

Elizabeth Smith (2012), A Road Map to Public Service Broadcasting, Asia Pacific Broadcasting Union (ABU), Malaysia, PP: 28-30.

Habermas, J. (1992) Further Reflections on the Public Sphere. In Calhoun, C. (ed.), *Habermas and the Public Sphere*, Cambridge, MA: MIT Press.

Jo Bardoel and Gregory Ferrell Lowe, From Public Service Broadcasting to Public Service Media : The Core Challenge in Gregory Ferrell Lowe and Jo Bardoel (eds) From Public Service Broadcasting to Public service Media RIPE@2007, Nordicom, Sweden, PP:11-15.

Lauren B. Frank, Joyee S. Chatterjee, Sonal T. Chaudhuri and etal (2012), *Conversation and Compliance : Role of International Discussion and Social Norms in Public Communication Campaigns*, Journal of Health Communication: International Perspectives, India, July, 2012, PP 1051-1056.

Lloyd John and Toogood Laura (2015), Journalism and PR : News Media and Public Relations in the Digital Age, I.B. Tauras & Co in association with the Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford, London, PP:3-5

Oxford (2015), Edward Bernays's "Torches of Freedom", Oxford University Press. Available at: http://www.oxfordpresents.com/ms/kelleher/edward-bernayss-torches-of-freedom/

Paul Rulkens (2014), Why the majority is always wrong, TEDxMaastricht, Netherland (Available at: http://agrippaci.com/ and also at: https://www.youtube.com/watch?v=VNGFep6rncY/).

Scannell, P. (1992) Public Service Broadcasting and Modern Public Life. In Scannell, P., Schlesinger, P. and Sparks, C. (eds) *Culture and Power*, London: Sage.

Slavko Splichal (2007), Does Hostory Matter? Grasping the Idea of Public Service Media at Its Roots in Gregory Ferrell Lowe and Jo Bardoel (eds) *From Public Service Broadcasting to Public service Media*, RIPE@2007, Nordicom, Sweden, PP:237-241.

Tatiane Leal, João Freire Filho and Everardo Rocha (2016), Torches of Freedom: Women, cigarettes and consumption, comun. mídia consumo, v. 13, n. 38, são paulo, Brazil, PP: 47-70 (Available at: http://revistacmc.espm.br)

Wikipedia, Article on Albert Einstein, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein, Date: 23 July 2018.

Wikipedia, Article on Vox Populi, vox dei, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Vox_Populi,_Vox_Dei, Date: 23 July 2018.

Response of receivers to tropical cyclone messages broadcast in Bangladesh: A lesson from Amtoli upazila of coastal Barguna district

Shaikh Muhammad Refat Ali[1]

1. Introduction

Coastal people of Bangladesh are the most vulnerable group who are directly and indirectly affected by tropical cyclone. The Government considers disaster risk reduction as its prime concern to save life and minimize all sorts of losses. Cyclone messages, given in proper time and appropriate way may contribute to implement the disaster management policy. With the nationwide spread of electronic media, in terms of radio, television and online media, as well as public, commercial and community-based broadcasting organizations, scope for response to tropical cyclone has been increased. This article analyzed the responses of receivers at the coastal region through a survey in Amtoli upazila of Barguna district, Bangladesh. Suggestions based on the findings are given in order to develop a broadcast model for the disaster-prone coastal people of Bangladesh.

2. Background

2.1 Disaster risk and vulnerability

World-wide disasters scenario in 2017 shows that weather-related disasters have been the major causes of both human and economic losses (CRED, 2018). If deadly storms with more than 10000 fatalities over the last 300 years are considered, 20 cyclones were formed over the Bay of Bengal, out of 23 (WMO, 2011). Forecast

1. Broadcaster, Faculty of National Institute of Mass Communication, Ex-Specialist of NHK World, PhD Fellow Researcher at BUP

messages are very much important to minimize such disaster risk and vulnerability.

2.2 Geography of the coastal areas

The coastal areas and offshore islands of Bangladesh are low-lying and flat. The Bay of Bengal lies to the south of Bangladesh. 147 upazilas of 19 districts, constituting 32% of the total geographical area, are affected directly or indirectly by tropical cyclone (Ali, 2017). Bangladesh has three distinct coastal regions: the western, the central, and the eastern. The western zone is very flat, low, crisscrossed by numerous rivers or channels and containing mangrove forest—the Sundarbans. A continuous process of accretion and erosion is going on in the most active central zone. The eastern zone is covered by hilly areas. It is comparatively stable and has a long beach there.

2.3 Tropical cyclone and its impact on the coastal area

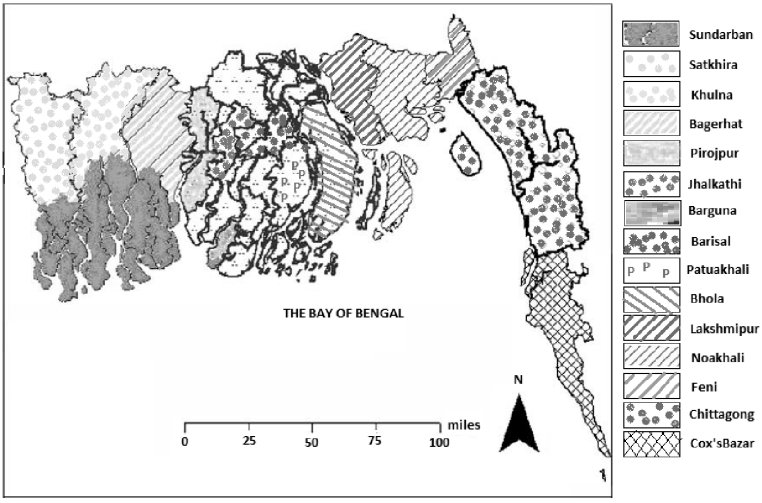

Picture 1: Cyclone risk areas of Bangladesh

Historically, the coastal communities of Bangladesh frequently face tropical cyclonic storm risks. A total of 117 tropical cyclones hit the coastal area of Bangladesh during the period of 1877 to 2003.

Of them, 39 are tropical depressions, 52 are tropical storms and 26 are of hurricane intensity (Islam & Peterson, 2009). Cyclone severity and death tolls of few top cyclones are given in Table-1.

Table-1: Cyclone Severity and Deaths in Bangladesh (1960-2010)

Year	Number of death	Wind speed
1961	11466	146
1963	11520	203
1965	20152	210
1970	500300	223
1991	138958	225

(Source: Haque et al, 2012)

The time beyond 2010 has experienced severe cyclone like Viyaru (also known as Mahasen) in 2013, Komen in 2015, Roanu in 2016 and Mora in 2017. So risk always exists and initiative is going on to cope with the challenges of tropical cyclone in Bangladesh.

2.4 Broadcasting in the coastal area

2.4.1 Availability: Availability of radio and television in the coastal areas ensures weather forecast and disaster management in Bangladesh. Radio, as a broadcast medium, reaches people through 5 government regional radio stations and 9 community radio stations. Regional radio stations of Bangladesh Betar at Chittagong, Cox's Bazar, Khulna and Barisal aware the local coastal people, while Bangladesh Betar Dhaka disseminates forecast and disaster messages at national level. Community radios at cyclone-prone coastal districts Barguna (Krishi Radio & Loko Betar), Satkhira (Radio Jhinuk), Jhinaidha (Radio Nalta), Khulna (Radio Sundarban), Bhola (Radio Meghna), Noakhali (Radio Sagordwip), Chittagong (Radio Sagorgiri) and Cox's Bazar (Radio Naf) ensures access to information in local languages (Ali, 2017). Bangladesh Television and other TV channels also provide forecast and updated disaster messages.

2.4.2 Accessibility: A survey by Bangladesh Bureau of Statistics (BBS, 2016) shows that 66.73% of the cyclone affected households got early warning during the cyclones of 5-years period (2009-2014) and 88.48% of them took preparedness during the cyclone.

Percentage distribution of household by type of media is shown in the bar chart-1 below:

Bar chart-1

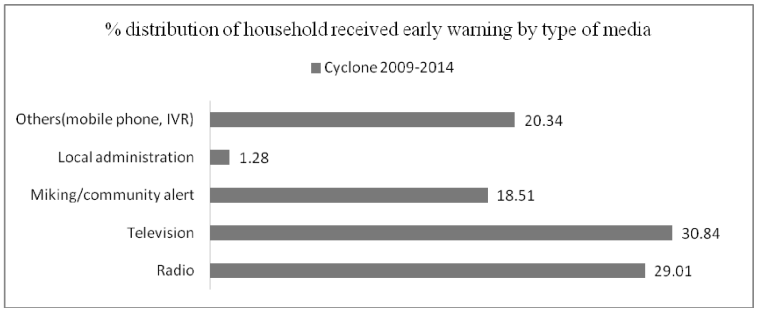

(Source: BBS, 2016)

3. Objectives

This research article contributes significantly in disaster management of cyclone-prone coastal areas in Bangladesh. The specific objectives are:.

- To identify the knowledge level of the coastal people and their interpretation of messages disseminated through electronic media on cyclone and disaster management.
- To analyze messages on cyclone, those are broadcast in radio targeting the coastal people.

4. Methodology

4.1 Study design

The research includes quantitative analysis taking into account three complementary angles on disaster-related radio broadcasting- (1) receivers' (listeners') knowledge level and message interpretation, (2) role of electronic media and broadcast organization and (3) broadcast content. In order to quantitative analysis, a sample of coastal people is taken. Questionnaire-based survey method is selected to gather data on listeners' socio-economic status, media usage pattern, knowledge of disaster and cyclone-related message interpretation. All public service radio and community radio stations available at the study area are considered.

4.2 Study period

The study is done from May 2017 to October 2017. In May 2017, severe cyclonic storm Mora caused widespread impact across Sri Lanka, Andaman & Nicobar islands, Myanmar, North-east India and Bangladesh. In order to get fresh feedback from the coastal people, the six-months period is utilized in the research process. Proposal writing, preparatory activities, questionnaire development, data collection, data processing and analysis are done within this period. Besides, literatures are reviewed during the whole study period.

4.3 Study population

The study is carried out among the coastal people through household survey. The primary census report, 2011 illustrates that total number of households (HHs) in 19 coastal districts of Bangladesh is 8056512. The 19 coastal districts are considered as the universe and person who experienced at least one major cyclone is taken as the target population of the survey. Randomly selected one person from each household is considered as a sample. Those who refused to participate and/or physically disable belongs to exclusion criteria.

4.4 Sample size

Data is taken from randomly selected one person from each of the sample households. Sample size is taken by using the following formula:

$$\text{Sample size, } N = \frac{Z^2pq}{d^2}$$

Where, Z = 1.96 (value of 95% Confidence level)

p = % of the cyclone affected households got early warning

q = (1- p)

The sample size is distributed among the randomly selected 8 upazilas in ratio of their household numbers under PhD research at BUP. This article considers the data of Amtoli upazilla for analysis. The sample size is shown in Table-2.

Table-2: Distribution of sample size

Division	District	Upazilla (Uz)	Union	HHs (Uz) Nos.	Sample size
Barisal	Barguna	Amtoli	Amtoli	63212	35

4.5 Study area

The coastal area of Bangladesh is chosen to identify knowledge level of and message-interpretation by the coastal people. Randomly selected districts are taken from the three coastal regions- the western, the central and the eastern. The selected district is Barguna. One upazilla (Amtoli) is randomly selected.

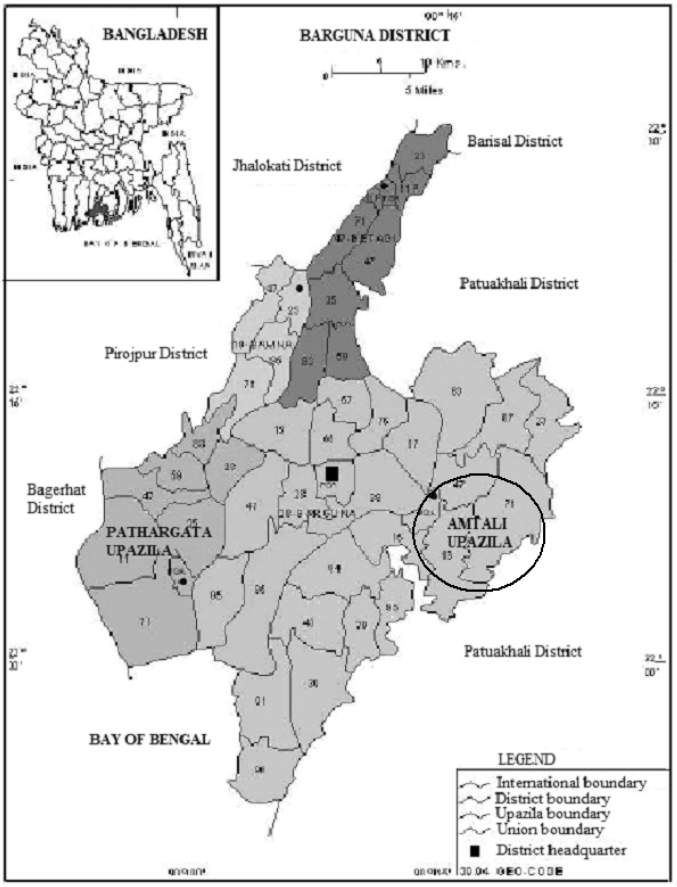

Picture-2: Map of Barguna district (BBS, 2013)

4.6 Questionnaire design, data processing and analysis

The questionnaire is designed using close-ended questions as well as Likert scale and other analytical technique. A door-to-door sample survey with questionnaire is done as data collection method for the study. After collection, the data is checked thoroughly for consistency and completeness. The data is checked on the day of collection to exclude any error or inconsistency or incompleteness. Data is coded and categorized at the time of data entry into the SPSS software version 22.0. Specific value is entered into each variable for each independent source of data. Errors are detected by descriptive statistic, scatter plots and histograms for checking any missing data, normality and after removal of outliers against normality is checked.

5.0 Scope and limitation

The research is focused on broadcasting for the coastal people of Bangladesh. As disaster is a global scenario, there is a scope to develop a broadcast model based on the empirical evidence and implement it in broadcasting of world-wide coastal areas. The research is limited to cyclone as disaster excluding other disaster like flood and earthquake. Messages broadcast in radio are considered under the research, ignoring television and online media. Broadcast organizations functioning in the coastal areas are taken into account.

6.0 Results

6.1 Socio-economic status

6.1.1 Gender and age distribution

The data shows that 14.3 % of the respondents participated in the survey are women. According to the household analysis, number of members in each household is 5.34 on an average. Among them

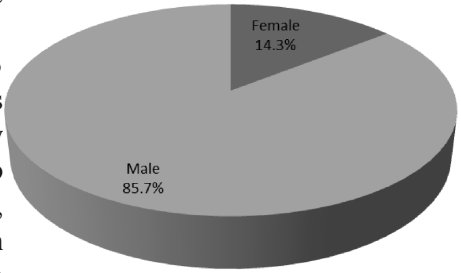

Pie chart 1: Participation of female in the survey

2.46 (>2) are female, 0.97 (about 1) are children below 18 years of age and 0.26 are old people aged 64+ years.

Table-3: Descriptive statistics of household gender and age distribution (N=35)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total member	1	12	5.34	2.141
Total women	0	5	2.46	1.268
Children below 18 years	0	4	.97	.985
Old people aged 64+	0	2	.26	.505

6.1.2 Education

Population by level of education of the respondents is presented in table-4. The highest 34.29% have educational level of class ten to twelve followed by 31.43% in class six to nine. It is found that 2.86% have no formal education and 20% have education at primary level.

Table-4: Number and percentage distribution of level of education

Group based on education	Years of study	Number of people	% of people
Illiterate	0 year	1	2.86%
Primary level	1-5 years	7	20%
Secondary level	6-9 years	11	31.43%
SSC/HSC equivalent	10-12	12	34.29%
Graduate & above	≥13 years	4	11.42%
Total		N= 35	100%

6.1.3 Demography

Table-5 shows the cross-tabulation of the respondents based on gender and age distribution. Among the respondents, 23 (65.71%) is at the youth and mid-age level (aged between 16-64 years) followed by 9 (25.71%) at the child level (aged equals or below 18 years).

Table-5: Cross-tabulation of age and gender

Gender	Children	Youth & Mid-age	Old	Total
	Age ≤18 yrs.	Age 19-64 yrs.	Age 64+ yrs.	
Female	4	1	0	5
Male	5	22	3	30
Total	9	23	3	35

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.040[a]	2	.011
Likelihood Ratio	8.116	2	.017
Linear-by-Linear Association	7.142	1	.008
N of Valid Cases	35		

a. 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .43.

6.1.4 Household income

Per head monthly household (HH) income of the respondents in Amtoli is taka 5185.44 on an average with a standard deviation of taka 4904.396. Per head monthly income ranges from minimum taka 800 to maximum taka 25000. 20% of the household have per head monthly income of less than 2000 taka. 48.57% of the household have per head monthly income between 2001 and 5000 taka. 22.86 % of the household have per head monthly income between 5001 and 10000 taka.

Table 6: Household income in Amtoli

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
per head income	35	800	25000	5185.44	4904.396
Valid N (listwise)	35				

Per head monthly income	Number of HHs	% of HHs
≤2000 taka	7	20%
2001-5000 taka	17	48.57%
5001-10000 taka	8	22.86%
10001-15000 taka	1	2.86%
15001-20000 taka	1	2.86%
20001-25000 taka	1	2.86%
	N= 35	100%

6.1.5 Source of income

It has been found that main occupation or main source of income of the household is agriculture (37.1%) followed by business (25.7%) and service (20%).

Table 7: Source of income in Amtoli

Main occupation of HH	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Agriculture	13	37.1	37.1
Business	9	25.7	62.9
Service	7	20.0	82.9
Daylabor	1	2.9	85.7
Others	5	14.3	100.0
Total	35	100.0	

6.2 Experience of disaster

Amtoli is a coastal disaster-prone area. Tropical cyclone is a common scenario for the inhabitants. According to the survey, every household (100%) have experienced more than two cyclones.

6.3 Usage of electronic media

6.3.1 Accessibility

Electronic media plays an important role to disseminate cyclone messages to mass people. If the total respondents are taken into account, we find that 34.3% of respondents use TV at household. Usage of FM radio and MW radio is higher. 48.6% use FM radio and 40% use MW radio.

Table 8: Usage of electronic media

Use TV at HH		Use FM radio at HH		Use MW radio at HH	
Numbers	%	numbers	%	Numbers	%
12	34.3%	17	48.6%	14	40%
N= 35	100%	N= 35	100%	N= 35	100%

6.3.2 Ownership of gadget or device

The data shows that the business community has comparatively higher percentages of ownership of devices like TV (77.78%), FM radio (55.56%) and MW radio (44.44%). Ownership of TV (15.38%) is low on people who have agriculture as main occupation. Table 9 shows the detail scenario.

Table 9: Availability of gadget according to main occupation

Ownership of gadget	Main occupation of HH				
	Agriculture	Business	Service	Day-labor	Others
TV	2 (15.38%)	7 (77.78%)	1 (14.29%)	0 (0%)	2 (40%)
FM Radio	5 (38.46%)	5 (55.56%)	4 (57.14%)	1 (100%)	3 (60%)
MW Radio	5 (38.46%)	4 (44.44%)	2 (28.57%)	0 (0%)	2 (40%)
N =35	13	9	7	1	5

Chi-square tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.119a	4	.714
Likelihood Ratio	2.512	4	.642
Linear-by-Linear Association	1.119	1	.290
N of Valid Cases	35		

a. 8 cells (80.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .49.

6.3.3 Listening channel

In case of choice of listening channel, people listen to several radio channels by tuning their radio or radio apps in mobile phone. It has been found that community radio is most popular in Amtoli upazilla (51.43%). Listeners of Bangladesh Betar (BB) Barisal (40%), BB Khulna (37.14%), BB Dhaka (34.29%), BB Chittagong (34.29%) and commercial radio (31.43%) are very close to each other.

Table 10: Choice of radio channel for listening

Radio channel	Number	Percentage (%)
Bangladesh Betar, Dhaka	12	34.29%
Bangladesh Betar, Chittagong	12	34.29%
Bangladesh Betar, Khulna	13	37.14%
Bangladesh Betar, Barisal	14	40%
Bangladesh Betar, Cox's Bazar	0	0%
Community Radio	18	51.43%
Commercial Radio	11	31.43%
	N= 35	

6.3.4 Choice of medium for cyclone message

In order to receive messages on cyclone, MW radio is considered mostly (62.86%) as 1st choice for the coastal people. 34.29% considers FM radio as 1st choice and only 2.86% considers TV as 1st choice. It is noteworthy that miking or community alert is considered as 2nd choice by most of the coastal people (58.06%).

Table 11: Choice of medium for cyclone message

Ranking	TV	FM Radio	MW Radio	Miking/ Community alert	Others (mobile message, IVR)
Rank 1	1 (2.86%)	12 (34.29%)	22 (62.86%)	0 (0%)	0 (0%)
Rank 2	1(3.23%)	4 (12.90%)	4 (12.90%)	18 (58.06%)	4 (12.90%)
Rank 3	5	2	1	6	3

6.4 Disaster-oriented evaluation of coastal people

6.4.1 Knowledge of cyclone

91.4% of respondents claim that they have knowledge of cyclone while 8.6% claimed their ignorance. When asked about the source or origin of cyclone 80% of them could recognize it correctly.

Table 12: Knowledge of cyclone

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	3	8.6	8.6	8.6
	Yes	32	91.4	91.4	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Table 13: Knowledge on place of cyclone formation

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Land	7	20.0	20.0	20.0
	Sea	28	80.0	80.0	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

6.4.2 Knowledge of weather forecast

91.4% of respondents claim that they have knowledge of cyclone while 8.6% regret it.

Table 14: Knowledge of weather forecast

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	3	8.6	8.6	8.6
	Yes	32	91.4	91.4	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

62.9% of the respondents acknowledge that they understand totally of what is told in forecast. On the contrary, 31.4% of the respondents understand partly and 5.7% of the respondents don't understand at all.

Table 15: Understand what is told in forecast

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	2	5.7	5.7	5.7
	Partly	11	31.4	31.4	37.1
	Totally	22	62.9	62.9	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

The scenario is changed when understanding of signal number is checked. 54.3% of the respondents understand signal partly, followed by 37.1% understand signal totally and 8.6% do not understand at all.

Table 16: Understand signal number

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	3	8.6	8.6	8.6
	Partly	19	54.3	54.3	62.9
	Totally	13	37.1	37.1	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

6.4.3 Knowledge of Response to Forecast

6.4.3.1 Response to Distant Cautionary Signal

11.4% of the respondents have no understanding of what to do in distant cautionary signal. 85.7% replied to follow forecast and 2.9% suggested starting preparation.

Table 17: What to do in distant cautionary signal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	don't know	4	11.4	11.4	11.4
	follow forecast	30	85.7	85.7	97.1
	start preparation	1	2.9	2.9	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

6.4.3.2 Response to Local Cautionary Signal

14.3% of the respondents have no understanding of what to do in local cautionary signal. 34.3% replied to follow forecast and 40.0% suggested starting preparation.

Table 18: What to do in local cautionary signal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	don't know	5	14.3	14.3	14.3
	follow forecast	12	34.3	34.3	48.6
	start preparation	14	40.0	40.0	88.6
	go to a safe place	4	11.4	11.4	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

6.4.5 Response to Danger Signal

100% of the respondents suggested going to a safe place in case of danger signal during weather forecast. There was no other choice among the respondents.

Table 19: What to do in danger signal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	go to a safe place	35	100.0	100.0	100.0

6. 5 Media usage during Mora

The cyclone Mora made land fall near Chittagong district on 30 May 2017. 97.14% of the respondents of Amtoli listened to radio at that time. On the contrary, 60% of the respondents viewed TV.

Table 20: Media usage during Mora

	Frequency	Percent
Listen to radio	34	97.14
View TV	21	60
N=35		

6.6 Disaster management practice during Mora

97.14% of the respondents of Amtoli feels the action of avoiding sea is not relevant to their action of disaster management. Only 2.86% avoided sea during Mora. 94.29% of the respondents tighten their house for safety. 91.43% of the respondents preserved food during Mora. 54.29% went to the shelter centre to ensure safety. On the contrary, 45.71% of the respondents remained at home during Mora.

Table 21: Disaster management practice during Mora

	Yes		No		Not relevant	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Avoid sea	1	2.86	0	0	34	97.14
Tighten house	33	94.29	2	5.71	0	0
Preserve food	32	91.43	3	8.57	0	0
Go to a safe place other than shelter centre	0	0	35	100	0	0
Go to a shelter centre	19	54.29	16	45.71	0	0

7.0 Discussion

Once a warning is issued that there is a cyclone approaching towards the coast, radio plays a vital role by alerting people to go to the evacuation centre (Ali, 2017). The survey shows that on an average 5 persons may die if a family fails to receive the message of any cyclone.

- The cyclone of 1991 was very much fatal for Bangladesh causing death of 138958 people. Study revealed that 90% of the victims were women and children (Rahman et al, 2007). The

survey shows that there are more than 2 female and at least 1 child below 18 years of age live in each family on an average. Message to aware the vulnerable group and ensure their going to shelter house during disaster is very much important

- Amtoli is a coastal disaster-prone area. Tropical cyclone is a common scenario for the inhabitants. According to the survey, every household (100%) have experienced more than two cyclones.
- Usage of TV (34.3%), FM radio (48.6%) and MW radio (40%) is low at household level in Amtoli. Ownership of TV (15.38%) is low at households having agriculture as main occupation. Radio is comparatively cheap and every mobile phone can be used to listen to FM radio. Usually electricity becomes unavailable during the disaster period due to unavoidable circumstances. So radio can be utilized to inform forecast messages to the people hard to reach.
- It has been found that MW radio is considered mostly (62.86%) as 1st choice for cyclone messages. Yet long-term used local systems of message dissemination through miking and community alert have not lost its importance. Multimedia approach is applicable to reach all sorts of people under threat of cyclone. There are trained Red Crescent volunteers in the coastal areas. Most of them possess mobile phone to communicate with each other. If the volunteers report on the local situation via mobile phone, it may be broadcast live in radio. The end result is dissemination of information to mass people directly.
- Among the radio listeners, people listen to several radio channels and community radio is at the top (51.43%) in Amtoli upazilla. Listeners of Bangladesh Betar (BB) Barisal (40%), BB Khulna (37.14%), BB Dhaka (34.29%), BB Chittagong (34.29%) and commercial radio (31.43%) are very close to each other. These sources can be used for building awareness on disaster risk reduction.
- It is noteworthy that 97.14% listen to radio and 60% watched TV during Mora. It indicates the importance of these two media during cyclone.

- Knowledge level of the coastal people on cyclone and weather forecast is accessed in the survey. It is obvious that there is a gap between perception and reality among the coastal people. Living in the coastal disaster-prone area, 20% respondents mistakenly informed land area as a place of cyclone formation.
- 62.9% of the respondents acknowledge that they understand totally of what is told in forecast. On the contrary, 31.4% of the respondents understand partly and 5.7% of the respondents don't understand at all.
- The survey indicates that 11.4% of the respondents don't know about the action required during distant cautionary signal. Probably they are not sure of the required action, but took the appropriate action based on past experience during cyclone Mora. 2.86% people avoided sea and the action was irrelevant for the rest of people (97.14%). 94.29% tightened their houses and 91.43% preserved food for the crisis period.
- The contrast between perception and action on danger signal is very much alarming for disaster management. It has been found that 100% respondents know of the message to go to a safe place. But 45.71% did not follow the message and remained at home. An easy-to-follow message is required in weather forecast through radio to manage disaster. Simple messages in weather forecast should be used, so that the target groups can understand easily, completely and react accordingly.

8.0 Conclusion

As a matter of tropical cyclone, the coastal communities experience death of nearby people and survive with huge social and financial losses. Availability of public service broadcasting as well as community broadcasting may play a vital people in the coastal area. They may focus more on disaster preparedness measures before the disasters strike (Kuppuswamy, 2012). Response of the receivers at Amtoli shows the loop holes of the messages that are broadcast through electronic media during disaster. The survey is limited to a specific coastal area of Bangladesh. Increasing the geographical area would result in a more conclusive decision to broadcast programs on disasters.

References

Ali, S. M. R. (2017). Radio program to minimize risk of cyclone in Bangladesh. National Institute of Mass Communication Journal. Year 1. Volume 1. pp. 117-133.

BBS (2016). Bangladesh Disaster –related Statistics 2015: Climate change and natural disaster perspectives. Impact of Climate Change on Human Life (ICCHL) Programme. Bangladesh Bureau of Statistics. Dhaka.

BBS (2013). District Statistics 2011. Barguna. Bangladesh Bureau of Statistics. Statistics and Informatics Division. Dhaka.

CRED (2018). Natural disasters in 2017: Lower mortality, higher cost. Issue 50. Cred Crunch. EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. Brussels.

Haque, U., Hashizume, M., Kolivras, K. N., Overgaard, H. J., Das, B., Yamamoto, T. (2012). Reduced Death Rates from Cyclones in Bangladesh: What More Needs to be Done?

Islam, T., Peterson, R. E. (2009). Climatology of landfalling tropical cyclones in Bangladesh 1877-2003. Nat Hazards Journal. 48:115-135.

Kuppuswamy, S. (2012). Usage of Media in Disaster Preparedness: With Reference to Coastal Disasters in Chennai Tamil Nadu, India. Asian Journal of Environment and Disaster Management. Vol. 4: Issue 3, pp. 269-281.

Rahman, A. A., Alam, M., Alam, S. S., Uzzaman, M. R., Rashid, M. & Rabbani, G. (2007). Background Paper on Risks, Vulnerability and Adaptation in Bangladesh. UNDP Human Development Report 2007/2008. Fighting climate change: Human solidarity in a divided world. UNDP.

WMO (2011). Tropical cyclone operational plan for the Bay of Bengal and Arabian Sea. World Meteorological Organization. Tropical Cyclone Program Report. TCP-21, WMO/TD-84. (Available online at https://www.wmo.int/pages/prog/www/tcp/documents/TCP-21_2011final.pdf)

Utilization of Community Radio to Ensure Women Empowerment in Bangladesh

Dr. A. K. M. Anisur Rahman

1. Introduction

Radio is not of a recent origin. People are acquainted with commercial radio and public radio. Community radio can emerge a new era of communication for the rural people in Bangladesh. There is a lack of effective mass media for the rural disadvantaged population of Bangladesh. Commercial radio does not focus on the views and demands of local rural population (Couldry, 2011: p. 166-169). Besides, programs and contents of commercial radio are not community people oriented; rather those encourage the western culture. Community radio falls under the community broadcasting category. Community radio is that kind of radio which is owned and controlled by a community and always broadcast those programs which are very much related to that community interest (Dhoest, 2015: p. 68-69).

2. Background of the Study

Community radio plays a vital role in the communications of a country. It mainly serves a definite community and is a form of community service broadcasting. It reflects the culture, ideology, thoughts, norms and values of a particular community (Hofstetter et al., 2016: p. 501-505). Community radio as the media of citizens of a particular community has become popular and new opportunity for both the media practitioners and grassroots people. It helps to avail utilities and amenities for various development aspects of the society

such as education, health, water supply and sanitation, protection from natural disasters, addressing social issues at the community level, and connecting rural population with the government. It can be useful for the development of a particular target group like elderly, women and children (Kellner, 2010: p. 33-37).

Community radio helps to ensure people's right to information and community participation by expressing the voices and thoughts of grassroots people in the development process. Moreover, the United Nations, the Organization of American States, the African Commission on Human and People's Rights, and eminent economists such as Amartya Sen, Joseph Stieglitz and Jeffrey Sachs, among others, have recognized the relationship between sustainable development and freedom of expression, reflected in a pluralistic and independent media sector (Louw, 2017: p. 09-11). It can facilitate the disadvantaged and vulnerable groups of the country by raising their voice, focusing on their problems, expressing their modern updated ideas, and thinking for the development of the whole nation. It can play a significant role for the rural development of developing countries through emphasizing agriculture, education, health and sanitation, recreation, and social problems of a target community (Anderson, 1999: p. 161-164).

There are about 17 community radios broadcasting 135 hours programs in a day across Bangladesh. But still the numbers of community radios are not sufficient in the country to represent the interest of local rural population. And the programs they broadcast are not well-targeted towards women empowerment (Rahman, 2015: p. 13-17). Considering these drawbacks, the present study has been conducted to find out the importance of community radio and formulate policy suggestions in the context of Bangladesh to ensure women empowerment.

3. Literature Review

3.1 Community

Community refers to a group of people with common characteristics or interests living together within a larger society. In other words, the term community can be defined as a condition in

which people find themselves engaged in interwoven and meaningful relationships with their fellows (Napoli, 2011: p. 211-216). A community is considered to be a group of people sharing some familiar characteristics and traits such as sharing a common geographical area i.e. a specific city, town, or village; sharing of economic and social life through business and trade, exchange of goods and services among themselves (Gaynor, 2016: p. 87-89). In relation to community radio, the term 'community' refers to a collective or a group of people sharing common characters and interests. The term 'community' can either be defined as a geographically based group of persons or a social group or sector of the public who have common or specific interests (Orozco, 2009: p. 17-19).

3.2 Community Radio

Community radio, as distinct from commercial and public service broadcasting, serves to bring local level small communities together, focuses on general public's day-to-day concerns and helps in realizing local demands and aspirations. In this sense, it aims to enrich the livelihood of the local people, through the content that is created by the people and for the people of the community (Sussman, 2001: p. 232-236). Community radio is also defined as a non-profit agency which is considered to serve specific local communities; thereby broadcasting programs and contents which are relevant to the community and with organizational structures that represent the community the radio station work for (Frisch, 2013: p. 24-29).

3.3 Community Radio in Bangladesh

Though in a small number, community radio has started its journey in Bangladesh. It is needed to take initiative to increase the number of community radio in Bangladesh. At present, there are 14 community FM radio stations in different locations of Bangladesh (Mansur, 2017: p. 65-67). These stations broadcast local level programs and contents which reflect the culture, views, ideas, problems, and sufferings of the community. The history of radio broadcast in Bangladesh dates back to the then British India and

started broadcasting on 16 December 1939 as All India Radio at the old part of present Dhaka, the capital of Bangladesh. In 1971, former Radio Pakistan changed its role as a front to assist the nation achieving its independence. Radio Bangladesh has been functioning as Bangladesh Betar from all stations since the victory of Bangladesh on 16 December, 1971. Bangladesh Betar, only public radio transmission agency, has country-wide broadcasting network program with many FM channels to add to its operational efficiency (Rahman, 2017: p. 20-23).

3.4 Legislative Mandate for Community Radio in Bangladesh

Community radio facilitates the right to information by promoting the right to communication and assisting the flow of information. It also ensures the democracy in the country by expressing and sharing the views of rural communities. The linkage between community radio and community people is increasing day-by-day. In some areas, community radio has become a part of everyday life of local-level people. To introduce the community media in Bangladesh and giving focus on its vital role as representing the voices of the disadvantaged people, Bangladesh NGO's Network for Radio and Communication (BNNRC) has been struggling for about 12 years. As a result of it, the Community Radio Installation, Broadcast and Operation Policy 2008 has been announced by the Ministry of Information of the People's Republic of Bangladesh (Ministry of Information, Government of Bangladesh, 2008: p. 01-39). In this context, Government of Bangladesh has approved 14 community radio stations so far. The government enacted the Right to Information Act 2009 to ensure the free flow of information to the people (Transparency International Bangladesh, 2009: p. 01-54). Community radio stations are a strong march to give power to rural people. It is really admirable for the government to realize the importance of radio, which is older than a century but still very much useful for its easy user friendliness and universal acceptability. Mass people awakening programs and movements along with those advocacy programs organized by national and international NGOs, pro-active partners and associations have supported the government to give approval and implement the policy.

3.5 Chronology of Establishment of Community Radio in Bangladesh

The chronology of establishment and development of community radio in Bangladesh is depicted in the following table (Hasan, 2016: p. 11-23):

Table 1: Chronology of Establishment of Community Radio in Bangladesh

Timeline	Key Activity	Key Player	Purpose	Milestone Achievement
1998	Application for establishment of Community Radio to the Ministry of Information (MoI)	Media Community (MC)	To set up Community Radio in Bangladesh	Started Establishment process of Community Radio
1998	Formulation of Advocacy Plan for Community Radio entitled 'Policy Advocacy of Community Radio in Bangladesh'	Media Community (MC)	To set up Advocacy Plan for Community Radio	Advocacy Plan for Community Radio formulated
1999	Arrangement of First National Mass Media Conference	Centre for Development Communication (CDC)	To detail out Set-up Plan for Community Radio	Set-up Plan for Community Radio detailed out
2000	Establishment of Bangladesh NGOs Network for Radio and Communications (BNNRC)	Bangladesh NGOs Network for Radio and Communications (BNNRC)	To continue Advocacy Program with other concerned organizations for Community Radio	Bangladesh NGOs Network for Radio and Communications (BNNRC) established
2006	Three day Round Table on Community Radio	Bangladesh NGOs Network for Radio and Communications (BNNRC)	To build-up Mass Awareness with other concerned organizations for Community Radio	Mass Awareness for Community Radio built-up
2008	Community Radio Awareness Workshop	Commonwealth Educational Media Centre for Asia (CEMCA), Bangladesh Open University (BOU), Development Research Initiative (DNet) and Bangladesh NGOs Network for Radio and Communications (BNNRC)	To develop Human Resource for Community Radio	Human Resource for Community Radio developed
2008	The Community Radio Installation, Broadcast and Operation Policy-2008 Formulated	Ministry of Information (MoI)	To formulate a Comprehensive Policy Guideline for well-functioning of Community Radio in Bangladesh	Comprehensive Policy Guideline for well-functioning of Community Radio in Bangladesh formulated

4. Methodology of the Study

India has similar socio-cultural background to Bangladesh. They have set-up a number of community radios across the country, especially in the southern region. They have successfully utilized community radio to achieve empowerment of women. Therefore, this investigation conducted a case study regarding how India utilized community radios to attain women empowerment. On that basis, this study recommended policy options to engage community radio operating in Bangladesh to achieve empowerment of women.

5. Utilization of Community Radio

Community radio can create awareness among the people about social issues. It can give information regarding agriculture, production, weather updates, disaster alerts etc. Community radio can play a significant role to minimize crime. After the crime is committed, community people can inform their community radio about it. This information would be shared to people of other areas, police and other law enforcing agencies. Community radio can perform a vital role for educating the illiterate section of our country. School and college curriculum based education programs can be broadcast for drop-out students. In the modern civilized world, farming is based on technology. The proportion of using modern technology in agriculture of our country is not up to the mark. As a result, the production rate is less than other developed countries. Community radio can broadcast informative programs regarding use of modern technology for farmers. Besides, marketing and purchasing of seeds and saplings and different methods and strategies of preserving them can be made easier through the informative programs of community radio.

6. Different Aspects of Women Empowerment

In Bangladesh, women comprise almost half of its total population. While the status of women in Bangladesh is being advanced at a fast pace, still our women are discriminated, marginalized, and oppressed just because of their gender. But, women are vital human resources in improving the overall quality of life as the country's overall development depends greatly on the inclusion of women in its development process. They have been the transmitters of culture in all societies. The status of women in a society is a true index of its cultural, social, religious, and spiritual levels. Empowerment is essentially a transition from a position of enforced powerlessness to one of power. It promotes women's inherent strengths and positive self-image (Obera, 2012: p. 14-19). Empowerment literally means making someone powerful, facilitating the weak to attain strength, to increase one's self-esteem, to help someone to be assertive and self-confident, to

enable someone to confront injustice and oppression and to support someone to fight for her rights (Howley, 2015: p. 87-90).

Woman empowerment is a process that enables a powerless woman to develop autonomy, self-control and confidence and with a group of women and men, a sense of collective influence over oppressive social conditions (Matza, 2009: p. 225-229). Empowerment is a process by which the powerless gains greater control over the circumstances of their lives. It is now central in political, social, educational, cultural, sexual, personal, and managerial discourses. Empowerment is related with redistribution of power. Empowerment has both personal and social aspects. At personal level, it is a significant change in the self-image and mental set and at the community level, it is a collective struggle for positive social change (O'Sullivan, 2005: p. 52-57).

7. Case Study: Role of Community Radio in Empowering Women in India

7.1 Prologue

It is not easy to achieve women empowerment. The resistance comes from family, society, and conditioning of disempowered women's mentality. However, strategy for women empowerment needs special attention. There are various methods and means for women empowerment. Some of popular methods of women empowerment include education, entrepreneurial training programs, formation of self-help groups, social action such as feminist movements, legislation, mass communication, and propaganda. Mass media are the chief agents of creation, preservation, and eradication of different kinds of images and stereotypes of women in the contemporary world. Visual media like television is more popular than the newspaper and magazines. The information people receive through newspaper, radio, and television shapes their opinions about the world. It is the mass media which should begin the process of women empowerment in the modern world. But women are depicted in their traditional role in most media and their images are simply decorative in the advertising media. The more decision-making positions women

hold in the media, the more they can influence output. They will be able to break the old stereotypes about women. Government, voluntary organizations, social activists, and others are trying in their ways for the development of women (Poindexter, 2017: p. 38-48). India and Bangladesh have similar socio-cultural background. Women are under-privileged in both the countries. India has successfully utilized community radio to achieve empowerment of women. Therefore, community radios established in India have been investigated to make a case-study to suggest policy recommendations to empower women in Bangladesh.

7.2 Case I: All India Radio

From its beginning, the primary aim of AIR (All India Radio) was to inform, educate and entertain the public. One of the AIR's major objectives was to serve the needs of women and promote their welfare and development. In 2006, when community radio policy guidelines were issued for establishing community radio stations in India, its primary aim was the development of community with the help of it (Kasoma, 2015: p. 243-247). So community radio is thought of as a tool which can promote development of the country, and, indirectly, the welfare of women.

7.3 Case II: The Namma Dhwani

The Namma Dhwani (Our Voices) of Karnataka is India's first cable community radio station. Started in March 2003, it was launched as a partnership effort of the Budikote community, and a couple of NGOs, i.e. MYRADA and VOICES with funding provided by UNESCO. VOICES is devoted to communication development and capacity building support. Activities relating to broadcast production were done by the Budikote community. The listeners of this community radio are primarily illiterate women, who otherwise have little access to information. Over the last few years, a number of capacity building programs have been carried out with the help of NGOs. As of today, Namma Dhwani is a fully functional community multimedia centre, with radio, video, and satellite facilities. It is also completely self-sufficient through locally generated revenue (Parameswaran, 2015: p 12-17).

Namma Dhwani programs not only created awareness among its listeners, but also enhanced the leadership qualities and behavior in women. It has much more impact on women when it comes to creating awareness about health and sanitation, education, savings, food habit and family system, etc. (Gamson, 2017: p. 312-319) and it brought about significant changes in the life of the people in Budikote. Hence, it played a catalytic role in changing the life of the rural people.

7.4 Case III: Sangham Radio

Sangham Radio another pioneer in the field of community radio was launched in Telangana (earlier in united Andhra Pradesh) on 15 October, 2008 – the World Rural Women's Day – by the Deccan Development Society, an NGO that works with 100 groups of the economically poorest Dalit women. Sangham refers to village-level women's collectives. Sangham Radio is intended to give a voice to the excluded in general and to women in particular (Rodriguez, 2016: p. 124-130). This radio station is owned, managed, and operated exclusively by women from rural marginalized communities (the 'Dalit' caste). The radio broadcasts to a radius of 25 km covering about 100 villages and a population close to 50,000.

7.5 Case IV: Manndeshi Tarang

Another community radio station Manndeshi Tarang, Maharashtra, was established on 16 December, 2008 by Mann Vikas Samajik Sanstha, an NGO working for the empowerment of rural and marginalized women. Manndeshi Tarang is providing relevant programs aimed at enriching civic and cultural life. The community radio is operated under the guidance of the Mann Deshi Foundation but is owned by the Mhaswad village community and surrounding coverage areas. Manndeshi Tarang has proved to be useful to women in their life (Fairchild, 2016: p. 48-52). It increased their knowledge, and enabled them to showcase their talent and also motivating them in various aspects.

7.6 Case V: Radio Namaskar

Another popular community radio Radio Namaskar was launched in Orissa on 11 July, 2010 by Young India, a civil society organization formed by some National Youth Awardees, Indira Gandhi National Service Scheme (NSS) Awardees, and few Ex-NSS volunteers who are committed to the social transformation and development, to make the common people informative and active participant of the community development process. The test broadcasting was started on 12 February, 2010 and was inaugurated formally in July. Radio Namaskar (FM 90.4 MHz) is currently focused on local governance, women empowerment, food security and youth development along with the other societal need-based issues. The community radio programs aim to enhance the psychological, economic, cultural, political, and social status of their female audience (Cohen, 2015: p. 41-47). Women, both producers and listeners, have started to reflect on their abilities and aspirations and on other women's life; their capabilities to produce programs and interact with audiences have grown since they began. They have acquired confidence in speaking in public and in challenging discriminatory traditions. Their ability to make informative choices is enhanced by an improved access to a vast array of information, including women's rights; they have also acquired or improved writing skills and familiarized with information technology and media. To some reporters, this community radio represents a source of income and listeners increase their possibility to access employment opportunities through livelihood-related information; their consideration within family and community is improved (Vebra, 2009: p. 146-151).

7.7 Case VI: Anna FM

Anna University, Tamil Nadu, launched the first campus radio in India on 02 February, 2004 called Anna FM. The listeners of Anna Radio are urban low and middle class from the nearby urban clusters in a 5–10 km range of Anna University. This radio station played an important role in social, economic, and political empowerment of women. When it comes to social empowerment, it happened in terms of knowledge and skill development. In terms

of political empowerment, this community radio helps in knowing the Panchayat representative, voting in assembly and general elections. When it comes to economic empowerment, this community radio assists learning job skills through radio; freedom to spend money has happened. The important aspect of this community radio is that it has given voice to the community especially women and the marginalized. In the case of Anna Radio women empowerment among the community radio listeners is significant (Rosenstone, 2013: p. 101-105).

7.8 Case VII: Holy Cross Community Radio

Another campus radio, the Holy Cross Community Radio, Tamil Nadu was launched on 26 December, 2006 by Holy Cross College. The station has eight hours of transmission, including repeat transmission, a day. It reaches in and around 10 km of Holy Cross College. The target audience of this radio initiative was the women from Dharmanathapuram and Jeevanagar areas, which are the major slum areas in Trichy. A case study was conducted by Holy Cross College in 2008 to find out the reach and access of its community radio and its role in the community development of the local slums. The study found that 27% of the respondents participated in the Holy Cross community radio programs and some women revealed that Holy Cross's radio programs increased their self-confidence, generated awareness about pollution, health and hygiene, and helped in their personality development. (Tettey, 2013: p. 255-260)

7.9 Case VIII: Puduvai Vaani

Puduvai Vaani is established by Pondicherry University, Puducherry, on 27 December, 2008 with the support of University Grants Commission, New Delhi. It works under FM 107.8 MHz, a frequency which is currently extended to a catchment area of 20 km radius from the university campus. The test transmission of Puduvai Vaani was started on 23 August, 2008 and was inaugurated by Shri.V. Narayanasamy, the then Union Minister of State for Planning & Parliamentary Affairs on 27 December, 2008 in the presence of Shri. P. Chidambaram, the then Union Home Minister. The full-time

transmission started on 01 January, 2009. The main objective of Puduvai Vaani is to create awareness among the people and to improve their lifestyle. Puduvai Vaani is the public broadcaster to awaken, inform, enlighten, educate, and entertain all sections of the people including the program on women empowerment, communal harmony, health, and education. It is also bringing out the hidden talents of students in and around the university campus. Pondicherry University conducted a study in 2012 to study the development of rural women through community radio within the area of Pillaichavady village and the data were collected from 100 women respondents. The study found that through the Puduvai Vaani community radio programs, nearly 87% of respondents felt it had contributed to their education. They also responded to be better informed, especially about health issues. About 64% of the respondents found that the programs' nutrition information is useful. More than half of the respondents said it contributed to an improvement in their attitude (Milan, 2017: p. 23-29).

8. Policy Recommendations in the Context of Bangladesh

It has been evident from the case study about the role of community radio to empower women in India mentioned in the previous article that community radios enhanced the participation of women in program production and created awareness among the women listeners about health, sanitation, education, food habits, and family systems leading to a significant change in their daily lives. The important aspect was that the radio developed leadership qualities and behavior among the women listeners. Community radios proved to be useful to the listeners, which consists mostly of women. It increased their general knowledge and enabled them to showcase their talent and motivated them on various issues including education, health, etc.

Community radio, for its part, can play an important role in social, economic, and political empowerment of women in Bangladesh too. In terms of political empowerment, it can help them get to know the public representatives and to enable them to vote in the general elections. In terms of economic empowerment, the

community radio programs can also help women to attain job skills and consequently, increase their income. More importantly, community radio can give voice to the women of the community. Community radio programs help boost women's self-confidence, generate awareness about pollution, health, and hygiene and aspects of personality development. Community radio programs can help empower women in different ways which include psychological, economical, cultural, political, and social improvements. Women, both producers and listeners, can start to reflect on their abilities and aspirations and on other women's life. Their capabilities to produce communicative acts in future, through media and at an interpersonal level, seem to be stronger. They can acquire confidence in speaking in public and in challenging discriminatory traditions. Their ability to make informative choices is enhanced by an improved access to a vast array of information, including women's rights. They can also acquire or improve writing skills and get familiarized with information technology and media. Their consideration within family and community is improved.

Hence, the community radio can be the source of empowerment of women. Radio can change the lives of women, it gives them voice, it gives them courage to fight for their rights, it creates awareness about various issues from the beginning of the rights of women, to health, maternity, violence, and nutrition. Radio also educates women about their political rights, voting, women's representations in various political institutions etc. It empowers them to fight back the domestic violence and male-preference attitudes, gives them courage to speak their opinion on all issues to express their interests. It gives them confidence to live their life with proper dignity. So community radio in Bangladesh can do wonders if utilized properly for the empowerment of women.

Government of Bangladesh should take all-out measures to utilize community radio to ensure women empowerment. It should formulate a comprehensive policy to guide the types and contents of the programs to be broadcast in the community radio. Programs focusing on health and hygiene, education and livelihood of

women should be encouraged. Such programs would undoubtedly utilize community radio and contribute towards empowerment of women.

References:

Anderson, Heather (1999), '*Desperately Seeking the Audience*', Routledge, New York.

Cohen, Sylvie (2015), 'The untapped potential of participation: Evaluating community media audiences', *Australian Studies in Journalism*, *16*, Griffith University Press, Brisbane.

Couldry, Nick (2011), 'Community media in a globalized world: the relevance and resilience of local radio', *The Handbook of Global Media and Communication Policy*, Massachusetts.

Dhoest, Alexander (2015), 'Social movements', *The Oxford Handbook of Civil Society*, Oxford University Press, Oxford.

Fairchild, Charles (2016), '*Community radio and public culture*', Hampton Press, New Jersey.

Frisch, Michael (2013), '*Community media: People, places, and communication technologies*', Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Gamson, William (2017), '*A Passion for Radio: Radio Waves and Community*', Black Rose Books, Montreal.

Gaynor, Namh (2016), 'Knowledge and foreign policy opinions: Some models for consideration', *Public Opinion Quarterly, 30,* University of California Press, Berkeley.

Hasan, Shariful (2016), 'The Struggle for Community Broadcasting in Bangladesdh', *Malaysian Journal of Media Studies, Vol. 12, No. 2*, Kualalumpur.

Hofstetter, C. Richard, Mark C. Donovan, Melville R. Klauber, Alexander Cole, Carolyn J. Huie, and Toshiyuki Yuasa (2016), 'Political talk radio: Actions speak louder than word', *Journal of Broadcasting & Electronic Media, 41(4),* Routledge, New York.

Howley, Kevin (2015), 'Community radio stations as community technology centers', *Nordicom Review, 33*, Oslo.

Kasoma, Francis (2015), '*The emancipation of women: An African perspective*', Ghana University Press, Accra.

Kellner, Douglas (2010), '*Public opinion and American democracy*', Columbia University Press, New York.

Louw, Eric (2017), 'The media and cultural production', *Retrieved from: http://www.cbsonline. org.au/index.cfm?pageId=4,18,3,262.*

Mansur, Ahmad (2017), 'Political economy, power and new media', *New Media and Society, 6(1)*, Penang.

Matza, Tomas (2009), 'Community integration, local media use, and democratic processes', *Communication Research, 23(2)*, New York.

Milan, Stefania (2017), 'Believed efficacy and political activity: A test of the specificity hypothesis', *The Journal of Social Psychology, 131(4)*, Kansas.

Ministry of Information, Government of Bangladesh (2008), 'Community Radio Installation, Broadcast and Operation Policy', *Retrieved from:<http://www.moi.gov.bd/resouces/Community Radio_Policy_2008_English.pdf>*.

Napoli, Philip (2011), '*Community radio for development: The world and Africa*', Paulines Publications Africa, Nairobi.

Obera, Rideout (2012), 'The Challenge, Empowerment and Sustainability of Community Radio Stations in Timor Leste', *Economic Development and Cultural Change, 10*, Sydney.

Orozco, Graciela (2009), 'Local rural radio as a development radio: Dzimwe community radio in Malawi', *Global Journal of Communication for Development and Social Change, 2(2)*, Cambridge University Press, Cambridge.

O'Sullivan, Sara (2005), 'Doing audience ethnography: A narrative account of establishing ethnographic identity and locating interpretive communities in field work', *Qualitative Inquiry*, *5:4*, Capetown.

Parameswaran, Radhika (2015), 'Talk radio: Predictors of use and effects on attitudes about government', *Journalism & Mass Communication Quarterly*, *73(1),* Boston.

Poindexter, Mark (2017), 'Public education about globalization: the role of the mass media', *Convergence*, *29:4*, Massachusetts.

Rahman, Bazlur (2015), 'The Role of Community Radio is Central to Development', *Journal of Anthropological Research, 31,* Chicago.

Rahman, Masud-ur (2017), 'Community Radio and National Security Exigencies of Bangladesh: Fears and Promises', *New Media and Mass Communication, 17*, Thailand.

Rodriguez, Clemencia (2016), '*The people's choice*', Columbia University Press, New York.

Rosenstone, Steven (2013), '*Social Movements and Their Technologies: Wiring Social Change*', Palgrave Macmillan, Hampshire.

Sussman, Gerald (2001), '*Fissures in the Mediascape: An International Study of Citizens*', Hampton Press, New Jersey.

Tettey, Wisdom (2013), '*Teaching Defiance: Stories and Strategies for Activist Educators*', Jossey-Bass Publications, San Francisco.

Transparency International Bangladesh (2009), 'Implementing Right to Information Act in Bangladesh: Opportunities and Challenges', *Retrieved from:<http://www.ti-bangladesh.org/Right-to-Information-22.06.09.pdf>*.

Verba, Sidney (2009), 'Community Development Research: Merging Communities of Practice', *Community Development Journal, 39(2)*, Washington.

Evaluating Gender Sensitivity in Three Mainstream Bangladeshi Cinema: A Critical Analysis

Sharmin Jahan Juha

1. Introduction

Prominent Bangladeshi film critique, director and cultural activist Alamgir Kabir once said, "Bangladesh will certainly be among those few countries where the cinema will probably continue to survive when it will have moved into the museums of other countries." (Kabir 1979:92). This quote holds true to this day. Despite numerous technological advancements, cinema is still the popular choice of entertainment for almost 80% Bangladeshis. According to a study conducted in 1990, Bangladesh annually produces 80 to 100 films on average. (Masud 2011:n.p) and is one of the leading cinema generating industries in the Asian Subcontinent. The ratio of film production in Bangladesh is increasing in a stark pace. Question remains, however, that whether these films have a sound quality and are their gender portrayals standard. The aim of this research is to shed light on the practices of contemporary films in Bangladesh and to see whether the contents of these films are gender sensitive, or fair to the three kinds of gender in our society: male, female and transgendered, namely third gender or hermaphrodite.

To fulfill this purpose a content analysis has been done in this report of three types of contemporary, mainstream, Bangladeshi films. Later, in-depth analysis of the cast, music, cinematography, production etc. were carried out to gauge the gender bias or gender balance in the films.

Three Bangladeshi mainstream films are taken as sample for this research. The films are ***Bossgiri*** directed by Shamim Ahamed Roni, ***Rani Kuthir Baki Itihash*** directed by Samia Zaman and ***Third Person Singular Number*** directed by Mostofa Sarwar Farooki.

Evaluations have been made after carefully watching and decoding the content of these films and observing the reactions of audiences in the cinema-hall of Bangladesh.

1.1 Introduction to Research Problem:

According to Webster's Dictionary, cinema or film is the art or technique of motion pictures. That is, any picture or image that is in motion can be termed as film or cinema. Nevertheless, this is linear definition of cinema. Films do more than just moving pictures around- they represent life. Famous French film theorist Andre Bazin describes films as an 'ideological phenomenon'. According to him, humans have an instinctive urge to escape mortality and preserve his/her likeness in one form or another. In his book ***What is Cinema,*** Bazin states that from time immortal humans have tried to depict their realities through various art forms (cave paintings, engraving, mummying etc.). They have "an ethical and ideological obsession in the arts of depicting reality". Therefore, cinema or movie is the ultimate form of art where the real life can 'come to life'.

No doubt, Bazin's aforementioned notion of film is ideological. Although films are supposed to portray the reality exactly as it is, we, at least in Bangladesh, often see that films are far from reality. They are fixated on some pre-existing, medieval theme and do not progress with time. Especially in the case of gender portrayals.

Since films occupy such a gigantic space in our life, its effects on our outlook is indispensable. Films with gender insensitive storyline, music or production can have negative effects on the minds of the viewers and can provoke gender discrimination of any sort. So, examining the film content and digging out the harmful element is a crying need. Therefore, the focus of this research is to identify the gender insensitiveness of our film content

and proposing probable solutions to counter this event or identifying what is then, gender sensitivity.

1.2 Historical Background

In this section, I will focus my attention on the historical background of 'cinema culture' in Bangladesh and how it came to be in the form it is in today.

Bangladesh film industry is known as *Dhallywood*. It is a mixture of two words "Dhaka" and "Hollywood", as dominant Hollywood films "flood the world screens" (Choudhuri, 2005:3). The name already suggest the huge impact Hollywood has on Bangladeshi film industry. However, not just Bangladesh but many other Asian and African countries are enormously influenced by the production practices of Hollywood films.

Professor Andrew Higson in his book ***The Concept of National Cinema*** (1989) says "Hollywood has...of course, for many years been an integral part of the national culture, of the popular imagination, of most countries in which cinema is an established entertainment form." Certainly it is the case for Bangladesh as these film practices which are alien to Bengali culture are shaping our notion of nationalism every day.

Even though there are visible Western influences in our film industry, the culture of cinema or film as an entertainment form has indigenous roots in Bangladesh. The reason many people call Bangladesh films 'Chobi' is that they are portrayed as still images with frames moving forward, just like Jatra.

Jatra, simply translated as theatre, is an integral part of Bengali culture. Originally, Jatra means a journey. This is a musical theatre wherein a narrative is described with music, dance, melodrama, loud acting style, colorful costumes and puerile love stories. Although Hollywood films were permitted to be aired on Bangladesh theatres, it failed to attract mass appeal. Since most of the cinema-going people in our country are illiterate or have prejudiced notion of foreign cultures, the Hollywood films with their Western plots did not resonate with that of Bangladesh. This

prompted Bangladesh to incorporate its' own national and cultural lifestyles and beliefs backed up by Western practices of film production.

Even our modern day Bangladeshi films resemble the acting and storytelling nature of the Jatra. Therefore, it can be stated that Jatra is the ancestor of todays' mainstream, modern Bangladeshi films.

Bangladeshi films were either based on our ingenious folklores or were inspired by religious or cultural practices. ***Beder Meye Josna*** (Daughter of a Snakecharmer, 1989) is such an example. After its release in 1989, it made almost 150 million Taka of profit while its production cost was only 2.5 million taka. In 2004, another folktale story, ***Khairun Shunduri*** (A Beautiful Lady, Khairun), was listed as the highest-grossing movie in Bangladesh since ***Beder Meye Josna***. However, before Independence the most commercially successful film was ***Rupban*** (1965) which was re-made into Indian and West Bengal versions over time.

The Bollywood Influence: Professor Stephen Crofts of Griffith University, Australia critics' Bangladeshi cinema as "other entertainment…with genres of melodrama, comedy, and action thriller and ultimately an imitation of Indian Cinemas."[4]

Bollywood does indeed have a tremendous influence on our filmmakers. Screening of Bollywood films in Bangladesh started from 1965. With the advent of satellite technologies, it was even more convenient for Indian films to reach Bangladeshi audiences. More than 60 channels and counting are screening Indian films of various types to a heterogeneous audience in Bangladesh. Since Bangladeshi people are more endorsed in watching Bollywood movies day by day, our own film industry is facing a threat of extinction. Having no other alternative, newly emerging filmmakers of our country are following the mainstream 'Bollywood Formula' of dance-romance-action stereotype. As a result, our Bangladeshi culture in general is being hybridized.

During 1960s and 1970s, Bangladeshi films depicted the struggle and hardships of middle-class society, where emotions like love, hate, and responsibility were main criterion for a leading role's

characteristics. These types of films used the cheap sentiments and emotional values of the urban poor and middle-class audiences and portrayed characters who were epitome of pureness but were caught between the fight of good and evil. The idea was that, seeing a bigger person battling his/her inner evil and defying all odds of poverty was a big emotional release for the audiences who identified themselves with the character on screen.

In 1980s, with the incorporation of Bollywood themes came the trend of eroticization with lots of violence and thrill. The reason behind this was the growing popularity of Amitabh Bachchan for his heroic and 'angry young man' roles in Bollywood, which were at the height of popularity. They were also popular in Bangladeshi movie theatres and TV screens as well.

Thus, Bollywood films have not only shifted the Bangladeshi audience's taste of films but also their ideology and mindsets. The situation became worse when on April 2010, Faruk Khan, Bangladesh Minister of Commerce, lifted the ban on releasing and screening of Indian films on Bangladeshi movie theatres. This proposal met with fierce criticism from artists but was welcomed by film distributers and cinema hall owners, as they would otherwise be bankrupt. The Bangladesh film industries proposed that in order to protect the Bangladeshi films various measures such as building of multiplexes, reduction of taxes on tickets, preventing video piracy, modernizing the state owned BFDC*, establishing film centers or national film institutes etc. be taken before lifting the ban.

However, in addition to these themes of traditional cinema, a new kind of independent movie genre has emerged in recent times- Alternative films. Alternative films are a new form of independent cinema that are mostly anti-establishment based and their production is done outside the studio, therefore, not complying to conventional studio norms. These alternative films were inspired by European and Indian films and echoed Bazin's notion that cinema is a means of depicting reality. In their films, they tried to portray authentic Bangladeshi cultural heritage and indigenous traditions.

Whereas in mainstream cinema the century old concept of love-action-dance-eroticism are prevalent themes to this day. In my study, I have analyzed three mainstream movies. Meaning, these movies were not made to depict reality but to give audiences an emotional release by taking them in a rollercoaster ride to a world where everything was static and 'possible'.

1.3 Objective of the Study

The aim of this research is to ask ourselves whether these selected mainstream Bangladeshi films are gender balanced or not. Moreover, is there any scope for those who do not fit to any one-gender class- the third gendered people or not.

2. Research Questions:

The questions of this research are:

1. Is the portrayal of characters in these mainstream Bangladeshi cinemas based on patriarchal notion?
2. Are the main characters in mainstream Bangladeshi films victims of gender bias?
3. Are there any representation of third gendered people in these Bangladeshi films?

3. Theoretical Framework & Methodology

The theoretical framework for this study is set forth in Feminist film theory in general. Under feminist film theory, there are occasional interpretation of Laura Mulvey's Male Gaze Theory (1975/1989), Rey Chow's Primitive Passion (1995).

Feminist Film Theory: Feminist film theories emerged in the 1970s with the rise of a post-structuralist viewpoint. This theory emphasized that movies had significant meanings and gender portrayed in these movies conveyed a meaningful message. Therefore, the aim of feminist film critiques was to strike a balance among all the genders and bring equality of the roles played by various sexes.

Male Gaze Theory: In her 1975 book "Visual Pleasure and Narrative Cinema" Laura Mulvey referred to the theory of Male Gaze. Unlike other feminist theories of that time, Mulvey's theory

was described from a psychological perspective. She drew on Sigmund Freud and Joseph Lacan's notion that humans drew pleasure from observing erotic activities even when they are not actively participating in any. This phenomenon is called Scopophilia.

According to Male Gaze theory, the world and lives of women in literature and visual arts are depicted from a male perspective. It has three facets: a) the perspective of the person behind the camera, b) that of the person who is been represented on screen, c) that of the spectator.

Women are presented as erotic, sensual objects for the visual pleasure of the male (patriarchy) of society.

Primitive Passion Theory: According to this theory, humans have a general tendency of being nostalgic for the primitive past. That is, just like the primitive days, they want to rethink those moments when socially oppressed (mostly women) classes were commodified by the upper class (mostly men). He proposed this theory after analyzing the Fifth Generation Chinese filmmakers' tendencies to portray the feudal, non-industrialized ancient China and Chinese culture in their films.

In a film research conducted by Shilpakala Academy, the author held this theory to be valid for Bangladesh too.

4. Methods for the Study:

With the help of aforementioned film theories, three *randomly selected* Bangladeshi mainstream full-length films have been analyzed. These films are ***Bossgiri*** directed by Shamim Ahmed Roni, ***Rani Kuthir Baki Itihash*** directed by Samia Zaman and ***Third Person Singular Number*** directed by Mostofa Sarwar Farooki.

If we are to evaluate gender sensitiveness in these films, then firstly we have to find gender insensitivity. In order to identify gender biasness in these films, I have a taken a categorization approach. This is a ***qualitative*** research. Therefore, the categories cannot be quantified accurately but can be defined as intended by the researcher.

The research method used in this study is *Content Analysis*. Contents are analyzed based on five pre-planned codes or categories of gender inequality. They are:

1. The Prevalence of Male, Female and Third Gendered Characters in the film
2. The Age & Domesticity of The Characters on the film
3. Sexualization of the Characters in the Film
4. Occupation of the Related Characters in the Film
5. The Correlation between the Characters in Film and the Sex of the Director of the film.

5. Analysis of the Data and Results:

Following is a qualitative analysis of the three concerned movies and their level of gender insensitiveness measured by the five pre-planned categories of gender inequality on films:

Basics of the films:

Film	**Basic Information**
Bossgiri	**Lead Cast:** Shakib Khan, Shabnam Bubly **Director:** Shamim Ahmed Roni **Producer:** Topi Khan **Music:** Imran Mahmudul, Akash Dabbu **Genre:** Romantic Action Drama **Release**: 12 September, 2016.
Rani Kuthir Baki Itihash	**Lead Cast**: Ferdous Ahamed, Sadika Parvin Popy **Director**: Samia Zaman **Producer**: NTV **Music**: S. I. Tutul **Genre**: Drama-mystery **Release**: 6 June, 2006
Third Person Singular Number	**Lead Cast**: Mosharraf Karim, Nusrat Imrose Tisha, Topu **Director**: Mostofa Sarwar Farooki **Producer**: Mostofa Sarwar Farooki, Anisul Haque **Music**: Habib Wahid **Genre**: Drama **Release**: October 10, 2009

1. Prevalence of Male, Female and Third Gendered Characters in the Film:

"I don't like to play Holi with colors, I like to play holi with blood"- this was the first sentence of the official trailer of ***Bossgiri***. The plot of the movie was the story of a young man (Shakib Khan) who wanted to escape the miseries of middle-class society by becoming the 'don' of Dhaka city. Everyone calls the lead character in this film Boss although his real name was Lucky. With Lucky, Shabnam Bubly co-starred in the movie as Bubly, a doctor by profession.

According to a study conducted on 120 movies from 11 countries, the prevalence of female characters in an action movie is 23% only.[6] Although Bossgiri is an action-romance-drama film, almost 70% of its' content contains violence in the name of 'action'. The scarcity of women characters in the film proves it.

Following is a list of Speaking Characters in the film:

- Aryan Khan Lucky
- DK The DangerCrtous Killer
- Double DK male
- Pike
- Fathers of Lucky and Bubly
- Mothers of Lucky and Bubly
- A female child artist

Apart from the two mothers and the child artist, everyone was male. Therefore, we can see that the global cinematic trend of women's scarcity in action films is also true in Bangladesh.

If we look at the other movie, named ***Rani Kuthir Baki Itihash***, we do not see much difference.

Plot Synopsis: ***Rani Kuthir Baki Itihash*** is the story of an adult woman named Momo (Popy) who is trying to solve the murder mystery of her father. Momo is the protagonist of the film and her husband, Rudra (Ferdous) accompanies her in the quest.

It may sound that Momo is a powerful, self-dependent character. It is a mystery-drama film, as per the previous research women directors of films do not have much of a choice when choosing the

genre of the film. Very few in the world, and totally absent in Bangladesh, is the number of female action film directors.

However, the speaking characters of the film are Ferdous, Popy, Alamgir as Dr. Shahed, Tarik Anam Khan as a family friend and other minor characters include Rahamat Ali, Arunav Anjan, and MM Morshed. There were some minor characters in female roles but they all were shown as house cleaners.

In spite of being a female directed film, ***Rani Kuthir Baki Itihash*** is densely gender imbalanced film with only abundance of male characters in leading positions.

The third film I chose was Mustafa Sarwar Farooki's ***Third Person Singular Number.***

Plot Synopsis: An adult woman named Ruba (Nusrat Imrose Tisha) rendered homeless after her Hindu boyfriend was sent to jail. The film depicts the struggles Ruba had to go through as a homeless woman in Dhaka and her triumphant march against all odds of the society.

Unlike the previous two films, I found some sort of gender balance in this film. Not because the protagonist was female, as ***Rani Kuthir Baki Itihash*** was also a female-centered film but did not have female characters at all. This film tried to put forward different perspectives of different women.

Apart from Tisha, Musharraf Karim and Topu as the lead characters, the story included Aparna Ghosh, Abul Hayat and Rani Sarker.

*In the three films I chose to watch, there were no third gender role portrayals.

2. Age and Domesticity of the Characters of the Film

In tradition to Feminist film theories, it is given that movies 'make meaning'. This meaning depends on various factors. Age and domestic character of the stars is one of them.

Age is related to beauty. The same study conducted in 2014 found that women were more likely than men to be portrayed as young

and beautiful. Age range of these characters were marked as children (0-12yrs), teens (13-20yrs), adults (21-39yrs), middle-aged (40-46yrs) and elderly (65 or older).[6]

In that study, higher percentage of females were adults 57.6 than males 48.1. Whereas, a lower percentage of females were middle-aged or elderly (19.1%) than males (34.5%). This is a classic example of Mulvey's notion of *scopophilia*. Women on films are objectified and eroticized. And regardless of geographical distance, it is true that younger women are more desirable as sexual partners than aged ones.

In the movie ***Bossgiri,*** we see that Bubly and Lucky are adults. Since there was no other female speaking character in the film, it is hard to make a conclusion on this point. Nevertheless, we can see that the few female roles that ***Bossgiri*** portrayed were mostly adults, one children, and two middle-aged mothers.

Whereas most of the male characters in the film, fathers of Lucky and Bubly, two villain characters were middle-aged. And, lucky and his gang members were all in the adult age group.

Since age is related to beauty in girls and power in boys, we can conclude from here that most male characters of this film were in the middle-aged or adult age group. Which meant they had authority. Only two female characters (mothers) were depicted as middle-aged women, with neither power nor beauty. It helped to sketch out the perfect example of Primitive Passion.

If we take ***Rani Kuthir Baki Itihash***, same is the case. In that film both Momo and Rudra are adults. Alamgir and Tarik Anam Khan were depicted as middle-aged. Again, their aged quality was related to authority- the more seniority, the more powerful. Reverse is the case for women. Where middle-aged women (the house cleaners/caretakers) were depicted as less powerful and suppressed and Momo as a beautiful adult was portrayed in an important character. Furthermore, the elderly males were depicted just like the middle-aged women-powerless (servants and caretakers).

Therefore, there is vivid discrimination between the sexes based on their age. Young, beautiful women are rendered powerless but have important roles. Adult males are more likely to portray heroic roles

while aged men are depicted as authoritative figures. And adult males are the victims of Primitive Passion.

But what about the third film? Age gap and differences were not that prevalent in that film as people were depicted according to their respective screen characters. Although they did portray some age related stereotypes, such as Rani Sarkar's character was shown as having bad temper and mistreating her daughter-in-law. However, Abul Hayat's character as Rahman did impress me. It showed that although he was a pious person, his intentions were not very holy. It also showed that age has nothing to do with sexual harassment of girls, which was a deviant step in our film culture.

Domesticity refers to the home-girl or homeboy attitude of characters. There relational roles (parental, social or other) in the film. According to previous research, women are more likely to be shown as mother, girlfriend/ love or sexual partners and other caregiving roles. While men are shown as outgoing and rampant, carefree.

However, not all the movies hold this stereotype. In ***Bossgiri,*** we can see that almost all the female roles were either mothers, daughters or lovers. In the huge gang of Boss, there was not a single female goon. Unfortunately, ***Rani Kuthir Baki Itihash*** also yielded same result. In that, Tarik Anam Khan referred to Momo's mother Nilufer as somewhat 'unstable' because she was an outgoing person and had many male-friends.

In ***Third Person Singular Number***, we notice the care-giving nature of Topu. Musharraf Karim was also shown as having sentiments and emotions. Our film industry's norm is to show male characters as rough and tough heroes who do not have anything to with domestic characteristics of love and care. This poses a huge burden for the male in our society. It is high time our films realized that it is okay for a man to be sentimental and caring instead of always being tough like a coconut.

3. Sexualization & Objectification of the Characters:

In order to measure and define sexualization, in accordance with the previously mentioned study, I took four codes or criteria to be acknowledged as sexualization: sexy attire, exposed skin, beautify, thin.

It is worth mentioning that sexualization can happen to any character- male, female or third gender. These four criteria stand the same for them all.

Bubly was sexualized throughout the film. Her first appearance shot started from showing her pink lips and she was dressed such a way as if she was ramp modelling the whole time. The songs dedicated to Bubly were indirect invitation for sexual engagement

In terms of sexy ***attire***, Bubly was shown wearing Western attire like exposing tops, tight jeans etc. Although there is nothing wrong in these types of clothing, it is clearly the impact of globalization and particularly Bollywood and Hollywood cultural imperialism.

Her unnecessary makeup and dress up clearly put her on display for the audience to entertain the 'male gaze'. Likewise, Lucky was clad in colorful, exposing dress up as well. Sexualization with male characters happens when they are expected to be muscular, macho-man and have a pretty face at the same time.

In terms of ***beautifying***, men and women actors are facing discrimination. Not only women but also men are required to look beautiful. It is a show business after all where bodily beautification is the ultimate requirement.

In ***Rani Kuthir Baki Itihash*** and ***Third Person Singular Number***, the frequency of exposed skin was very low, but in ***Bossgiri,*** we see that there were body exposure- mostly of Bubly and comparatively less of Lucky.

In Bangladesh, thinness is not a big factor for beauty in films. However, the trend is changing. Example is Bubly. The most recent movie among the selected ones is Bossgiri (2016). The other two movies released in 2006 and 2009. Therefore the newly emerging films in our country depicts thin women and muscular men as beautiful, hence, worthy of being the lead character.

4. Occupation of the Related Characters in the Film

Here, occupation is regarded as any activity that is done in exchange of some monetary benefit or other provisions. Women comprise 50% of our total population. So, in order to have economic development, women's' role in economy cannot and must not be ignored.

If Bazin's notion was true, and movies did portray our real life on screen, then our economy would have been devastated. Because according to the study women comprise 22.5% of the total film workforce.

If we look at our selected films, apart from Ruba's role in ***Third Person Singular Number***, none of the female leads had an occupation. Those who did were mostly maids, caretakers, with due respect to these professions whatsoever.

In ***Rani Kuthir Baki Itihash***, Momo was never seen doing any kind of work- be it domestic or professional. She was always strolling around the house while the servants did all the job. Being a female-directed film, I expected it to portray a kind of women who is self-sufficient. However, Momo did have some authority in the household affairs and her husband was supportive of her- that was a positive side of this film.

Although Bubly was a doctor in the film, her occupation had nothing to do with her character in the film. When one of Lucky's friend fainted, they called doctor Bubly by kidnapping her and putting her in a sack.

Whereas, Lucky did not have any job but was living by the donations he collects from land leasing business. These donations were more like hijacking. Even though Lucky was below Bubly in occupational sense, he always imposed an authoritative stance upon her- stalking her, kidnapping her time and again, barging into her hospital and what not.

Only in ***Third Person Singular Number*** do we see that Ruba was an independent girl who did not want to live on others. She struggled to get a job and eventually found one. What was disappointing though, is that she agreed to get financial help from Topu. But this dependency was from both sides as Topu was helping her out of his infatuation on her.

Amidst so many movies where women are mostly shown as homemakers and unpaid caregivers, Ruba's role did stand out.

5. The Correlation between the Characters in Film and the Sex of the Director of the film.

Study found that amid 1,452 filmmakers, women directors were 7%, women writers and producers were 19.7% and 22.7% respectively.

These are the statistics from developed nations, yet the participation of women filmmakers worldwide is very disappointing. It is even worse for Bangladesh. The study brought into focus the glaring truth that films with female director or producers are more likely to portray female characters than vice versa.[7]

In my randomly selected films, only ***Rani Kuthir Baki Itihash*** was a female directed. Directed by Samia Zaman. Shamim Ahamed Roni and Mostofa Sarwar Farooki directed the other two movies.

Bossgiri debased women and men by portraying them as mere slaves of their primitive desire (lust). While, Samia Zaman's ***Rani Kuthir Baki Itihash*** did not openly degraded women, but it did portray them as delicate dolls who should be handled with care.

A point worth mentioning is the first opening scene of ***Third Person Singular Number*** where she was walking alone at night on street when a half-naked boy asked her what she was doing outside so late at night. Her reply to it was, "What are you doing outside so late?" This scene tells a lot about Ruba's independent character.

Another important aspect that I noticed in that film is how the character of Musharraf Karim (Munna) was portrayed. He was a person who had to succumb to his girlfriend's willingness to be separated. She honestly told him that she loves someone else and cannot choose between the two. Normally, if anything like this happened in Bossgiri or Rani Kuthir Baki Itihash, we all can guess what would have happened. However, Farooki put forward a strong example that sometime women can fight for what they believe and being 'Satee' or loyal to her partner has nothing to do with her moral character.

In the last scene of the movie, Munna was shown hiding in the bushes and talking to himself. He was acting out the things he

wanted to say to Ruba. Like "You cannot leave me. You are my wife. You have to do as I please." However, he didn't say those things to Ruba; instead, he agreed to remain friends with her until she figures out what she wants.

Being all that said, we can see that being directed by a female does not always lead to gender balanced portrayals of women. The reason behind this is even female directors can fall victim to patriarchal mindset. Although they are women, they are also part of the society. A society, which is governed by patriarchal rules and regulations.

6. Conclusion

To sum up, let us look at our three questions and find whether they held any ground. Our first question was whether these mainstream film characters are portrayed based on patriarchal notion. Apart from ***Third Person Singular Number***, the other two films were gender imbalanced. Leading or important characters were mostly males and the females yielded some or no power at all.

Our second question was whether these mainstream films are victims of gender bias. The answer to this question lies in the previous one. Since almost all the films were dense with male characters and very few female characters, we can conclude that they were indeed gender biased.

Our final question is somewhat ambiguous. As the films were randomly chosen, none of them had a plot of incorporating a third gendered person. Sadly, there are not many films in Bangladesh on third gendered people and few that do portray them do not show them as being empowered. As third genders constitute at least 20% of our population, it is important that their film participation should increase.

Therefore, ***Bossgiri*** and ***Rani Kuthir Baki Itihash*** are gender insensitive films. There is no such thing as a gender neutral film. Among the three selected films, only ***Third Person Singular Number*** was more gender sensitive than were others.

References

Ahsan M.S., Dudrah, R. (Editing) Bangladesh Film Industry: Challenges and Opportunities of Workforce Development in the Digital Age. The Jahangirnagar Review. Vol. XXVI, pp 147-173, ISSN 2306-3920.

Retrieved on April 28, 2018 from:

303256316_Bangladesh_Film_Industry_Challenges_and_Opportunities_of_Workforce_Development_in_the_Digital_Age

Akhter, F. (Editing) Panning from the Past to the Present: The Climate, Context and Content of Bangladeshi National Cinema. Shilpakala Annual Journal, (2014) Vol. XXII.

Retrieved on April 28, 2018 from:

https://www.researchgate.net/profile/Fahmida_Akhter2/publication/306263697_Panning_from_the_Past_to_the_Present_The_Climate_Context_and_Concept_of_Bangladeshi_National_Cinema/links/57b5963908aede8a665ba5ed/Panning-from-the-Past-to-the-Present-The-Climate-Context-and-Concept-of-Bangladeshi-National-Cinema.pdf.

Higson, A. (Editing) The Concept of National Cinema. Oxford University Press. (1989) Vol: 30

Retrieved on 28 April, 2018 from:

https://academic.oup.com/screen/article-abstract/30/4/36/1614862?redirectedFrom=fulltext

Smith, L. S., Choueiti, M., Pieper K. (Editing) An Investigation of Female Characters in Popular Films Across 11 Countries. Gender Bias Without Borders (2014)

Retrieved on April 25, 2018 from:

http://annenberg.usc.edu/sites/default/files/MDSCI_Gender_Bias_Without_Borders_Executive_Summary.pdf

Totaro, D. (Editing) Introduction to Andre Bazin, Part 1: Theory of Film Style in its Historical Context. *Andre Bazin Revised. Off Screen. (2003) Vol: 7.*

Retrieved on April 28, 2018 from:

http://offscreen.com/view/bazin4

www.nimc.gov.bd

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
১২৫/এ, এ.ডব্লিউ.চৌধুরী রোড
দারুস সালাম, মিরপুর
ঢাকা-১২১৬